POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025

আল্লাহ্‌র বাণী

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ
بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى
الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ

তিনিই তাঁহার রসূলকে হেদায়াত এবং সত্য ধর্ম সহকারে পাঠাইয়াছেন যেন তিনি ইহাকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করিয়া দেন, মোশরেকগণ যত অসন্তুষ্টই হউক না কেন।

(আত তওবা, আয়াত:৩৩))

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 10

সংখ্যা 7-8

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 13-20 ফেব্রুয়ারী, 2025 14-21 শাআবান 1446 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

মুসলেহ মওউদ সংক্রান্ত মহান ভবিষ্যদ্বাণী

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, সর্বশক্তিমান খোদা যিনি পরম দয়ালু ও বার বার কৃপাকারী, আমাকে তাঁর ইলহামে সম্বোধন করে বলেছেন:

"আমি তোমার প্রার্থনা অনুযায়ী- তোমাকে একটি রহমতের নিদর্শন দিচ্ছি। আমি তোমার কান্না শুনেছি। এবং তোমার দোয়াসমূহকে অনুগ্রহ করে কবুল করেছি, বরং তোমার সফরকে (হুশিয়ারপুর এবং লুধিয়ানা) তোমার জন্য কল্যাণময় করেছি।

"সুতরাং শক্তির, দয়ার এবং নৈকট্যের নিদর্শন তোমাকে দেওয়া হচ্ছে। বদান্যতা ও অনুগ্রহের নিদর্শন তোমাকে দেওয়া হচ্ছে। বিজয়ের চাবি তুমি প্রাপ্ত হচ্ছো। হে বিজয়ী! তোমার প্রতি সালাম। খোদা বলেছেন, যারা জীবন-প্রত্যাশী, তারা যেন মৃত্যুর কবল থেকে মুক্তি লাভ করে এবং যারা কবরের মধ্যে প্রোথিত, তারা বের হয়ে আসে, যাতে ইসলামের মর্যাদা লোকের কাছে প্রকাশিত হয় এবং সত্যতার যাবতীয় আশিসসমূহ উপস্থিত হয় এবং মিথ্যা তার যাবতীয় অকল্যাণসহ পলায়ন করে এবং মানুষ বুঝে যে, আমি তোমার সঙ্গে আছি এবং যারা খোদার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী এবং খোদার ধর্ম এবং কিতাব এবং তাঁর রসূলে পাক মহম্মদ (সাঃ) কে অস্বীকার করে এবং অসত্য মনে করে থাকে, তারা যেন একটি প্রকাশ্য নিদর্শন পায় এবং অপরাধীদের শাস্তির পথ পরিষ্কার হয়। "সুতরাং, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর এক সুদর্শন এবং পবিত্র-পুত্র তুমি লাভ করবে। সেই ছেলে তোমারই ঔরসজাত, তোমারই সন্তান হবে।"

"সুশ্রী, পবিত্র-পুত্র তোমার মেহমান আসছে। তার নাম আনমুয়ায়েল এবং সুসংবাদদাতাও বটে। তাকে পবিত্রাত্মা দেওয়া হয়েছে। সে কলুষ থেকে পবিত্র। সে আল্লাহর নূর। ধন্য সে, যে আকাশ থেকে আসে। তার সঙ্গে ফযল (বিশেষ কৃপা) আছে, যা তার আগমনের সাথে উপস্থিত হবে। সে বৈভব, ঐশ্বর্য ও গৌরবের অধিকারী হবে এবং তার সঞ্জীবনী-শক্তি ও পবিত্র আত্মার প্রসাদ বহুজনকে ব্যাধি মুক্ত করবে। সে 'কালিমাতুল্লাহ্'- আল্লাহ্‌তা'লার বাণী। কারণ খোদার দয়া ও সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ তাকে সম্মানিত বাক্য দ্বারা প্রেরণ করেছেন। সে অত্যন্ত ধীমান, প্রজ্ঞাশীল, হৃদয়বান' এবং গাম্ভীর্যশীল হবে। জ্ঞানে তাকে পরিপূর্ণ করা হবে। সে তিনকে চার করবে (এর অর্থ বুঝি নি) সোমবার শুভ সোমবার। সম্মানিত মহৎ, প্রিয়-পুত্র।

مَظْهَرُ الْاَوَّلِ وَالْاٰخِرِ ـ مَظْهَرُ الْحَقِّ وَ الْعَلَاءِ ـ كَاَنَّ اللّٰهَ نَزَلَ مِنَ السَّمَآءِ "অর্থাৎ সত্যের বিকাশ স্থল ও সুউচ্চ, যেন আল্লাহ্ আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছেন। তার আগমন বিশেষ কল্যাণময় হবে এবং ঐশী গৌরব ও প্রতাপ প্রকাশের কারণ হবে। জ্যোতিঃ আসছে, জ্যোতিঃ। খোদা তাকে তাঁর সন্তুষ্টির সৌরভ নির্যাস দ্বারা সিক্ত করেছেন। আমরা তার মধ্যে নিজ আত্মা দান করব এবং খোদার ছায়া তার মাথায় থাকবে। সে শীঘ্রই বর্ধিত হবে, বন্দীদের মুক্তির কারণ হবে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে খ্যাতি লাভ করবে। জাতিরা তার কাছ থেকে আশীর্বাদ লাভ করবে। তখন তার আত্মিক কেন্দ্র আকাশের দিকে উত্তোলিত হবে।

وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا অর্থাৎ এটাই আল্লাহর অটল মীমাংসা"

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ২০ ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

যৌক্তিক দিক থেকে এটি জানা থাকা উচিত, একজন মহিলাকে, যার ওপর হত্যার অপরাধ প্রমাণিত নয়, বন্দি করে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করা আর হত্যাও এত নির্দয়ভাবে করা যেমনটি এই রেওয়ায়েতে বর্ণনা করা হয়েছে, এটি তো অনেক দূরের বিষয়! ইসলাম তো নিজেই যুদ্ধক্ষেত্রেও নারীদের হত্যা করতে কঠোরভাবে নিষেধ করে।"

কিন্তু প্রশ্ন হলো, সাহাবীরা যেখানে উম্মে কিরফার চেয়েও কঠোর এবং অধিক রক্তপিপাসু শত্রুদের, এমনকি পুরুষ শত্রুদেরও কখনো এভাবে হত্যা করেন নি, সেক্ষেত্রে এই ধারণা করা যে, যায়েদ বিন হারেসার মতো (একজন) বিজ্ঞ সাহাবীর নেতৃত্বে এক বৃদ্ধা নারীর সাথে এমন (নিষ্ঠুর) আচরণ করা হয়ে থাকবে– (তা) কখনো গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

ইসলাম এই ধরনের মিথ্যা আবেগ–অনুভূতির সমর্থক ধর্ম নয়। ইসলাম অপরাধীকে অপরাধী হিসেবেই আখ্যায়িত করে আর তাকে শাস্তি দেওয়া দেশ ও সমাজের জন্য মঙ্গলজনক মনে করে। ইসলাম শরীর থেকে একটি রোগাক্রান্ত অঙ্গ কেটে ফেলার শিক্ষা দেয় এবং একটি অসুস্থ অঙ্গ আরেকটি সুস্থ অঙ্গকে স্পর্শ করে কলুষিত করবে– এর অনুমতি ইসলাম দেয় না।

বাকি রইল শাস্তি প্রদানের রীতি সম্পর্কিত প্রশ্ন; তৎকালীন আরবদের অবস্থার প্রেক্ষিতে এবং তৎকালীন মুসলিম ও ইহুদীদের মধ্যে যে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছিল সে প্রেক্ষিতে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল, যা সামগ্রিক শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যথোপযুক্ত ছিল।

নিঃসন্দেহে কোনো নারী যদি কোনো অপরাধ করে সে তার অপরাধের শাস্তি পাবে। আর কোনো ধর্মের বিধান কিংবা কোনো দেশের আইন নারীকে অপরাধের শাস্তির উর্ধ্বে ঘোষণা করে নি। প্রায়শ নারীদের শাস্তি (হচ্ছে), বরং হত্যার অপরাধে ফাঁসি দেওয়ার ঘটনাও (সংবাদপত্রে) প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু কেবলমাত্র ধর্মীয় শত্রুতার কারণে অথবা যুদ্ধে অংশগ্রহণের কারণে কোনো নারীকে হত্যা করা, তদুপরি এই রেওয়ায়েতে বর্ণিত রীতিতে হত্যা করা এমন একটি (গর্হিত) কাজ যাকে মহানবী (সা.)–এর নীতিগত শিক্ষা এবং সমগ্র ইসলামী ইতিহাস সুস্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করে।

বনু ফাযারা এবং আব্দুল্লাহ্ বিন আতীক–এর যুদ্ধাভিযানের বর্ণনা

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১০ই জানুয়ারী,, ২০২৫, এর জুমুআর খুতবা (১০ সুলাহ, ১৪০৪ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, গত খুতবার পূর্বে মহানবী (সা.)–এর যুগের সেনাভিযান ও যুদ্ধের বর্ণনা চলছিল। তাতে বনু ফাযারার অভিযানের উল্লেখ করা হয়েছিল। ইতিহাসে বনু ফাযারা গোত্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানে একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়, যা উম্মে কিরফার হত্যা সংক্রান্ত। কিছু ইতিহাসবিদ এই ঘটনাটিকে যেভাবে লিখেছেন, তা থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, এটি একটি অবাস্তব কথা। 'তাবাকাতুল কুবরা'–তে লেখা হয়েছে, হযরত যায়েদ বিন হারেসা ষষ্ঠ হিজরী সনে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তার সাথে মহানবী (সা.)–এর সাহাবীদের বাণিজ্যিক পণ্য ছিল। তারা যখন ওয়াদিউল কুরা–র নিকট পৌঁছেন তখন বনু ফাযারা গোত্রের শাখা বনু বদর–এর কিছু লোকের সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়, যারা তাকে ও তার সাথিদের মারধর করে আর তাদের কাছে থাকা সমস্ত মালপত্র ছিনিয়ে নেয়। এরপর হযরত যায়েদ যখন সুস্থ হয়ে ওঠেন আর তিনি মহানবী (সা.) সমীপে উপস্থি ত হয়ে তাঁকে (সা.) এই ঘটনার সংবাদ প্রদান করেন, তখন মহানবী (সা.) তাকে (একটি বাহিনীসহ) আক্রমণকারীদের প্রতি প্রেরণ করেন। মুসলমানরা দিনভর লুকিয়ে থাকত আর রাতে সফর করত। কিন্তু বনু বদর গোত্রের লোকেরা তাদের (আগমনের) এই বার্তা পেয়ে যায়। এরপর হযরত যায়েদ ও তার সঙ্গীরা সকালবেলা সেই লোকদের কাছে পৌঁছেন। তারা 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চকিত করেন এবং সেখানে উপস্থিত সবাইকে ঘেরাও করেন। উম্মে কিরফাকে, যার আসল নাম ছিল ফাতেমা বিনতে রবী'য়া বিন বদর এবং তার মেয়ে জারিয়া বিনতে মালিক বিন হুযায়ফা বিন বদরকে গ্রেফতার করেন। জারিয়াকে হ যরত সালামা বিন আকওয়া গ্রেফতার করেন এবং মহানবী (সা.)–এর হাতে তুলে দেন। মহানবী (সা.) এরপর তাকে হাযম বিন আবি ওয়াহাবের জন্য দান করেন।

এ বিষয়ে ইতিহাসের কতক পুস্তকে উম্মে কিরফার হত্যার ঘটনা, যেমনটি আমি বলেছি, অদ্ভুতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের আলোকে মেনে নেওয়া অসম্ভব।

যাইহোক, কতক বইয়ে লেখা আছে যে, কায়েস বিন মুহাসসের উম্মে কিরফাকে (হত্যার) সংকল্প করেন। সে একজন বৃদ্ধা নারী ছিল। কায়েস তাকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে হত্যা করেন। তার দুই পায়ে দড়ি বেঁধে দুইটি উটের সাথে বেঁধে দেন আর এরপর উটগুলোকে হাঁকিয়ে দিলে সেগুলো দৌড় দেয় এবং সেই নারীকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে। কায়েস আরো দুই ব্যক্তিকেও হত্যা করেন। হযরত যায়েদ বিন হারেসা নিজের এই অভিযান শেষে ফিরে আসেন এবং মহানবী (সা.)–এর দরজায় কড়া নাড়েন। তিনি (সা.) নিজের কাপড় ঠিক করে যায়েদের উদ্দেশ্যে বের হন এবং যায়েদকে আলিঙ্গান করেন ও চুমু দেন এবং যায়েদের কাছে খবরাখবর জিজ্ঞেস করেন। আল্লাহ্ তা'লা যায়েদকে যে বিজয় দান করেছেন সে সম্পর্কে তিনি মহানবী (সা.)–কে অবহিত করেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৬৯) (কিতাবুল মাগাযি, ওয়াকিদি, ২য় খণ্ড, পৃ: ৬১)

এই ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাকে চিরে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা হয়েছিল, কিন্তু হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এই ঘটনার বর্ণনা খুব যুক্তিসঙ্গিত করে সুন্দরভাবে দিয়েছেন।

তিনি লিখেছেন:হযরত আবু বকরের অভিযানের স্থলে, যার উল্লেখ এখনই করা হয়েছে, ইবনে সা'দ এমন একটি অভিযানের উল্লেখ করেছেন যার আমীর ছিলেন যায়েদ বিন হারেসা। অর্থা ৎ ইবনে সা'দ এ অভিযানে হযরত আবু বকর (রা.)-র স্থলে হযরত যায়েদ বিন হারেসাকে

আমীর হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণে কিছুটা দ্বিমত করে লেখেন, এই অভিযান বনু ফাযারাকে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছিল, যারা ওয়াদিউল কুরার পাশে বসবাস করত, যারা মুসলমানদের একটি বাণিজ্যিক কাফেলার ওপর আক্রমণ করে তাদের সমস্ত মালামাল ছিনিয়ে নিয়েছিল। এই নৈরাজ্যবাদী দলের চালিকাশক্তি ছিল এক বৃদ্ধা,যার নাম ছিল উম্মে কিরফা। সে ইসলামের ঘোর শত্রু ছিল। এই মহিলা যখন এ যুদ্ধে আটক হয় তখন যায়েদের দলের কায়েস নামের এক ব্যক্তি এই মহিলাকে হত্যা করে। ঐতিহাসিক ইবনে সা'দ এই হত্যার ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেন যে, তার দুই পা ভিন্ন ভিন্ন দুইটি উটের সাথে বাঁধা হয় আর এরপর উটগুলোকে বিপরীত দিকে হাঁকানো হয়, যার ফলে এই মহিলা মাঝখান থেকে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। আর এরপর এই বৃদ্ধা নারীর মেয়েকে সালামা বিন আকওয়ার হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই ঘটনাই কিছুটা সংক্ষিপ্ত পরিসরে ও ভিন্নভাবে ইবনে ইসহাকও বর্ণনা করেছেন।

আর এই রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে স্যার উইলিয়াম মিউর, যিনি একজন প্রাচ্যবিদ আর অন্যান্য ইউরোপিয়ান ঐতিহাসিকদের তুলনায় বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ায় অভ্যস্ত, এই ঘটনাটিকে মুসলমানদের বর্বর মনোভাবের উদাহরণ হিসেবে একান্ত আগ্রহের সাথে নিজ বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বরং স্যার উইলিয়াম মিউর এটিকে তার পুস্তকে উল্লেখের কারণই এটি বর্ণনা করেছেন যে, এই অভিযানে মুসলমানরা একটি নিষ্ঠুর কাজ করেছিল। মিউর সাহেব লেখেন:

"এ বছর মুসলমানদেরকে বিভিন্ন অভিযান নিয়ে মদীনা থেকে বের হতে হয়েছিল, কিন্তু সেগুলোর সব উল্লেখযোগ্য নয়। তিনি বলেন, 'যদিও সেগুলোর মধ্য থেকে একটির উল্লেখ না করে আমি পারছি না, কেননা এর পরিসমাপ্তি মুসলমানদের পক্ষ থেকে একটি অত্যন্ত নিষ্ঠুর আচরণের মাধ্যমে ঘটেছিল।' এটি হলো মিউর সাহেবের বর্ণনা।

এর বিশ্লেষণ করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লেখেন:

"যে ঐতিহাসিক একটি ঘটনাকে অন্যান্য ঘটনার ওপর প্রাধান্য দিয়ে শুধুমাত্র এই কারণে সেটিকে নিজ পুস্তকের অন্তর্ভু ক্ত করে যে, তাতে কোনো জাতির অত্যাচার ও নির্যাতনের প্রমাণ পাওয়া যায়- সে প্রকৃত অর্থে একজন নিরপেক্ষ গবেষক আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য নয়। কেননা তিনি লিখেছেন, অন্যান্য ঘটনা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র এই ঘটনাটিই আমি বর্ণনা করছি। এর অর্থ হলো তিনি পক্ষপাতদুষ্ট ছিলেন, নিরপেক্ষ গবেষক ছিলেন না। কেননা পক্ষপাতদুষ্ট ব্যক্তির কাছে এই আশা করা যায় না, সে এই বিষয়ে গবেষণা করার প্রতি মনোযোগী হবে যে, এই অত্যাচার ও নির্যাতনের ঘটনার কোনো বাস্তবতা আছে কি না? কেননা এমনটি করলে একটি প্রমাণ তার হাতছাড়া হয়ে যায়। যাহোক, মিউর সাহেব এই ঘটনাটিকে বিশেষ আগ্রহের সাথে নিজ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব বলেন, কিন্তু আমি এখন প্রমাণ করব আর এটি স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এই ঘটনা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও পুরোপুরি ভিত্তিহীন, আর যৌক্তিক ও বর্ণনা বা রেওয়ায়েতগত- উভয় দিক থেকে এর বানোয়াট হওয়া প্রমাণিত।

যৌক্তিক দিক থেকে এটি জানা থাকা উচিত, একজন মহিলাকে, যার ওপর হত্যার অপরাধ প্রমাণিত নয়, বন্দি করে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করা আর হত্যাও এত নির্দয়ভাবে করা যেমনটি এই রেওয়ায়েতে বর্ণনা করা হয়েছে, এটি তো অনেক দূরের বিষয়! ইসলাম তো নিজেই যুদ্ধক্ষেত্রেও নারীদের হত্যা করতে কঠোরভাবে নিষেধ করে।"

এ সম্পর্কে মহানবী (সা.) বহুবার স্পষ্ট করেছেন যে, নারীদের হত্যা করবে না। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, একবার যুদ্ধক্ষেত্রে কোনো এক শত্রুপক্ষের জনৈক মহিলাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তখন যদিও একথা জানা ছিল না যে, এই মহিলা কোন পরিস্থিতিতে এবং কার হাতে নিহত হয়েছে, তথাপি মহানবী (সা.) তাকে দেখে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। আর সাহাবীদের দৃঢ়ভাবে বলেন, আগামীতে যেন এমন কাজ সংঘটিত না হয়; কোনো মহিলাকে হত্যা করা যাবে না। অনুরূপভাবে মহানবী (সা.) যখনই কোনো সেনাদল প্রেরণ করতেন তখন অন্যান্য উপদেশের পাশাপাশি সাহাবীদেরকে এই উপদেশও প্রদান করতেন যে, কোনো নারী ও শিশুকে হত্যা করবে না।

এসব নীতিগত নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও সাহাবীদের সম্পর্কে, তা-ও আবার হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-র মতো সাহাবী সম্পর্কে , যিনি বলতে গেলে মহানবী (সা.)-এর পরিবারেরই সদস্য ছিলেন- এই ধারণা করা যে, তিনি কোনো নারীকে এভাবে হত্যা করেছেন বা করিয়েছেন যেমনটি ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন- এটি কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। যদিও রেওয়ায়েতে হত্যার জন্য যায়েদকে দায়ী করা হয় নি, বরং অন্য এক মুসলমানকে দায়ী করা হয়েছে; কিন্তু যেহেতু এই ঘটনা যায়েদের নেতৃত্বে ঘটেছে তাই এর চূড়ান্ত দায়ভার অবশ্যই যায়েদের ওপরই বর্তাবে। যায়েদ সম্পর্কে এই ধারণা করা যে, মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও তিনি এ ধরনের কাজের অনুমতি দিয়ে থাকবেন- (তা) আদৌ গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। নিঃসন্দেহে কোনো নারী যদি কোনো অপরাধ করে সে তার অপরাধের শাস্তি পাবে। আর কোনো ধর্মের বিধান কিংবা কোনো দেশের আইন নারীকে অপরাধের শাস্তির উর্ধ্বে ঘোষণা করে নি। প্রায়শ নারীদের শাস্তি (হচ্ছে), বরং হত্যার অপরাধে ফাঁসি দেওয়ার ঘটনাও (সংবাদপত্রে) প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু কেবলমাত্র ধর্মীয় শত্রুতার কারণে অথবা যুদ্ধে অংশগ্রহণের কারণে কোনো নারীকে হত্যা করা, তদুপরি এই রেওয়ায়েতে বর্ণিত রীতিতে হত্যা করা এমন একটি (গর্হিত) কাজ যাকে মহানবী (সা.)-এর নীতিগত শিক্ষা এবং সমগ্র ইসলামী ইতিহাস সুস্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করে। যদি বলা হয়, এই মহিলা অপরাধী ছিল; আর যেমনটি বিভিন্ন রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, সে মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল; এজন্য তাকে আইনগতভাবেই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া বৈধ ছিল- সেক্ষেত্রে এই যুক্তি যথার্থ । কিন্তু প্রশ্ন হলো, সাহাবীরা যেখানে উম্মে কিরফার চেয়েও কঠোর এবং অধিক রক্তপিপাসু শত্রুদের, এমনকি পুরুষ শত্রুদেরও কখনো এভাবে হত্যা করেন নি, সেক্ষেত্রে এই ধারণা করা যে, যায়েদ বিন হারেসার মতো (একজন) বিজ্ঞ সাহাবীর নেতৃত্বে এক বৃদ্ধা নারীর সাথে এমন (নিষ্ঠুর) আচরণ করা হয়ে থাকবে- (তা) কখনো গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

কাজেই যৌক্তিকভাবে এই ঘটনাটির মিথ্যা ও বানোয়াট হওয়া সবার কাছে সুস্পষ্ট, আর কোনো বিদ্বেষমুক্ত মানুষ এতে সন্দেহের অবকাশ খুঁজে পেতে পারে না।

বাকি রইল রেওয়ায়েত সংক্রান্ত দিক; এ প্রসঙ্গে প্রথম কথা হলো, ইবনে সা'দ ও ইবনে ইসহাক এই রেওয়ায়েতের কোনো সনদ দেন নি। কোনো ধরনের নির্ভরযোগ্য সনদ ব্যতীত এই ধরনের রেওয়ায়েত যা মহানবী (সা.)-এর সুস্পষ্ট নির্দেশনা এবং সাহাবীদের সাধারণ ও পরিচিত পদ্ধতির পরিপন্থি হয় তা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। দ্বিতীয়ত, এই ঘটনাটিই হাদীসের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ সহীহ্ মুসলিম এবং সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু এতে ঘুণাক্ষরেও উম্মে কিরফার নিহত হবার কথা উল্লেখ নেই। অন্যান্য বিশদ বিবরণেও ইবনে সা'দ প্রমুখের বক্তব্যের সাথে বিরোধ রয়েছে। সহীহ্ হাদীস যেহেতু সাধারণ ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত থেকে নিশ্চিতরূপে নির্ভরযোগ্য ও প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য, তাই সহীহ্ মুসলিম এবং সুনানে আবু দাউদের রেওয়ায়েতের বিপরীতে ইবনে সা'দ প্রমুখের রেওয়ায়েত কোনো মূল্য রাখে না। এই পার্থ ক্য আরো সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যদি আমরা এ বিষয়কে দৃষ্টিপটে রাখি যে, যেখানে ইবনে সা'দ ও ইবনে ইসহাক তাদের রেওয়ায়েতে সনদ ছাড়াই বর্ণনা করেছে, সেখানে ইমাম মুসলিম ও আবু দাউদ তাদের রেওয়ায়েতগুলোর পূর্ণ সনদ বর্ণনা করেছেন। এছাড়া হাদীস বিশারদদের সাবধানতার বিপরীতে, যারা (হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে) পরম সতর্কতা অবলম্বন করেছেন, ঐতিহাসিকদের সাধারণ রেওয়ায়েত কোনো মূল্যই রাখে না।

সহীহ্ মুসলিম আর সুনানে আবু দাউদে এই ঘটনা যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, এতে উম্মে কিরফার নিহত হওয়ার কথা পর্যন্ত উল্লেখ নেই। মুসলিম ও আবু দাউদের রেওয়ায়েতে উম্মে কিরফার নাম কোথাও উল্লেখ নেই আর দলনেতার নাম যায়েদের পরিবর্তে আবু বকর লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু এ কারণে এটি অন্য কোনো অভিযান বলে সন্দেহ করা যাবে না, কেননা বাকি সকল গুরুত্ব পূর্ণ বিবরণ এক ও অভিন্ন ।

যেমন- প্রথমত, দুইটি রেওয়ায়েতেই এটি সুস্পষ্ট যে, এই অভিযান বনু ফাযারার বিরুদ্ধে ছিল।

দ্বিতীয়ত, উভয় বর্ণনায় এটি উল্লেখ আছে যে, বনু ফাযারার সর্দার ছিল একজন বৃদ্ধা নারী।

তৃতীয়ত, উভয় বর্ণনায় এই নারীকে বন্দি করার উল্লেখ রয়েছে।

চতুর্থত, উভয় বর্ণনায় এটিও উল্লেখ রয়েছে, এই নারীর একটি কন্যাও ছিল, যে মায়ের সাথে বন্দি হয়েছিল।

পঞ্চমত, উভয় বর্ণনায় এটিও উল্লেখ রয়েছে, এই মেয়েটি সালামা বিন

যুগ ইমামের বাণী

সেই সময় দূর নয় বরং অতি নিকটেই যেদিন তোমরা আকাশ থেকে ফিরিশতাদের ফৌজ এশিয়া ,ইউরোপ ও আমেরিকার মানুষের মনে অবতীর্ণ হতে দেখবে। (ফতেহ ইসলাম, রূ-খা, খণ্ড-৩, পৃ: ১২)

দোয়াপ্রার্থী: Sayen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

আকওয়ার ভাগে এসেছিল।

এছাড়া আরো অনেক বিষয়ে মিল বা সামঞ্জস্য রয়েছে। এবার প্রণিধান করুন, এই গুরুত্ব পূর্ণ ও মৌলিক সামঞ্জস্য থাকা সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি কি সন্দেহ প্রকাশ করতে পারে যে, এই দুটি ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা?

কিন্তু আমরা শুধুমাত্র যৌক্তিক প্রমাণের ওপরই নির্ভর করছি না, বরং অতীতের গবেষকরাও স্পষ্টভাবে লিখেছেন যে, সহীহ্ মুসলিম এবং সুনানে আবু দাউদে সেই ঘটনাই বর্ণি ত হয়েছে যা ইবনে সা'দ ভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণনা করেছেন। যেমন, আল্লামা যুরকানী, ইমাম সুহায়েলী এবং আল্লামা হালাবী সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন, এটি সেই ঘটনাই যা ইবনে সা'দ এবং ইবনে ইসহাক উম্মে কিরফার ঘটনায় ভুলভাবে উপস্থাপন করেছেন। তবে এটিই যে সেই ঘটনা, একথার চেয়েও তার বড়ো প্রমাণ হলো, তাবারী এই উভয় রেওয়ায়েতকে পাশাপাশি উল্লেখ করে স্পষ্ট করেছেন যে, এই দুটি একই ঘটনা।

মোটকথা, এই বিষয়টি একেবারে সুনিশ্চিত যে, মুসলিম এবং আবু দাউদে বর্ণিত সালামা বিন আকওয়ার রেওয়ায়েতে সেই ঘটনাই বর্ণনা করা হয়েছে যেটি ইবনে সা'দ এবং ইবনে হিশাম উম্মে কিরফার যুদ্ধাভিযান নামে ভুলভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। যেহেতু সিহাহ্-র রেওয়ায়েত (অর্থাৎ হাদীসের যে ছয়টি বিশুদ্ধ গ্রন্থ রয়েছে;) সেগুলোর রেওয়ায়েত যা সনদসহ বর্ণনা করা হয়েছে এবং ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত এক ব্যক্তির ভাষায় বর্ণিত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে ইবনে সা'দ এবং ইবনে হিশামের অনির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতের চেয়ে (বেশি) গ্রহণযোগ্য। কাজেই, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, উম্মে কিরফার অমানবিক হত্যার ঘটনা একটি নিতান্তই মনগড়া এবং ভিত্তিহীন ঘটনা, যা ইসলামের কোনো অজ্ঞাত শত্রু এবং মুনাফিকদের সহায়তায় কোনো কোনো ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতে অনুপ্রবেশ করেছে। আসল সত্য হলো, এই যুদ্ধাভিযানের প্রকৃত ঘটনা এর চেয়ে বেশি কিছু নয় যা মুসলিম এবং আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন।

এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, কোনো ভুল ঘটনা ইতিহাসে অনুপ্রবেশ করতে পারে, কেননা এ ধরনের দৃষ্টান্ত সকল জাতি এবং সকল দেশের ইতিহাসে পাওয়া যায়। তবে এটি অবশ্যই এক বিস্ময়কর ব্যাপারে যে, স্যার উইলিয়াম-এর মতো মানুষ এই ভুল ঘটনাকে কোনো যাচাই-বাছাই ছাড়াই নিজের গ্রন্থে স্থান দেবেন এবং প্রকাশ্যে এই বিষয়টি স্বীকার করবেন যে, এটি লিপিবদ্ধ করার একমাত্র কারণ হলো, এর মাধ্যমে মুসলমানদের একটি পাশবিক কর্মের প্রমাণ পাওয়া যায়।

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ:৭১৭-৭২১)

যাহোক, এটি ঘটনাটিই ভুল; এটি এভাবে ঘটে নি।

ইতিহাসে সারিয়্যা আব্দুল্লাহ্ বিন আতিক-এর উল্লেখ পাওয়া যায়, যা আবু রাফে'র বিরুদ্ধে (পরিচালিত) হয়েছিল। ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন, এই যুদ্ধাভিযান ৬ষ্ঠ হিজরীর রমযান মাসে পরিচালিত হয়।

(তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৭০)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থের আলোকে নিজের যে গবেষণাকর্ম তুলে ধরেছেন তা হলো, আবু রাফে'র হত্যার সময়কাল সম্পর্কিত বিভিন্ন রেওয়ায়েতে মতভেদ রয়েছে। ইমাম বুখারী, যুহরীর অনুসরণে নির্দিষ্ট কোনো তারিখ উল্লেখ না করে এটিকে শুধু কা'ব বিন আশরাফের হত্যার পরের (ঘটনা) হিসেবে উল্লেখ করেছেন যা অবশ্যই সঠিক। সম্ভবত এই ঘটনাগুলোকে একসাথে উল্লেখ করার কারণ হলো, এগুলোর ধরন একই রকম। তাবারী একে তৃতীয় হিজরীতে কা'ব বিন আশরাফের (হত্যার) ঘটনার পরে উল্লেখ করেছেন। ওয়াকদী চতুর্থ হিজরীতে উল্লেখ করেছেন। ইবনে হিশাম, ইবনে ইসহাকের বরাতে একে বনু কুরায়যার যুদ্ধের পরে বলে উল্লেখ করেছেন যা পঞ্চম হিজরীর শেষাংশে সংঘটিত হয়েছিল এবং এভাবে এটিকে ৬ষ্ঠ হিজরীর প্রারম্ভেও হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে, কিন্তু ইবনে সা'দ এটিকে স্পষ্টভাবে ৬ষ্ঠ হিজরী বলে উল্লেখ করেন আর সাধারণ ইতিহাসবিদরা ইবনে ইসহাকের অনুসরণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন।"

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ:৭২৬)

ইবনে ইসহাক বলেন, পরিখা এবং বনু কুরায়যার যুদ্ধ যখন শেষ হয় আর সালাম বিন আবিল হুকায়েক অর্থাৎ আবু রাফে' সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিল যারা মহানবী (সা.) বিরুদ্ধে সৈন্য সমারোহ করেছিল। আর অওস গোত্র উহুদ যুদ্ধের পূর্বে কা'ব বিন আশরাফ নামক ইহুদীকে মহানবী (সা.)-এর সাথে শত্রুতার জেরে এবং তাঁর (সা.) বিরুদ্ধে উস্কানি দেওয়ার কারণে হত্যা করেছিল, তখন খাযরাজ গোত্র মহানবী (সা.)-এর নিকট সালাম বিন আবিল হুকায়েককে হত্যা করার অনুমতি প্রার্থনা করে। সেসময় সে খায়বারে ছিল। তিনি (সা.) তাদেরকে অনুমতি প্রদান করেন। এই উভয় গোত্র অর্থাৎ অওস এবং খাযরাজ মহানবী (সা.)-এর দরবারে পুণ্যের ক্ষেত্রে দুটি সতেজ উটের ন্যায় প্রতিযোগিতা করত। অওস গোত্র মহানবী (সা.)-এর জন্য কোনো কাজ করলে খাযরাজ গোত্রের লোকেরা বলত, এরা তো এই কাজের কারণে মহানবী (সা.)-এর নৈকট্যভাজন হবে এবং ইসলামে আমাদের চেয়ে এগিয়ে যাবে! সুতরাং তারা যতক্ষণ তাদের সমপরিমাণ কোনো কাজ না করে দেখাতো, ততক্ষণ ক্ষান্ত হতো না। আর খাযরাজ গোত্র যদি এমন কোনো কাজ করত তাহলে অওস গোত্রও তাদের অনুরূপ কিছু করত। অওস গোত্রের লোকেরা যখন মহানবী (সা.)-এর সাথে শত্রুতার কারণে কা'ব বিন আশরাফকে হত্যা করে তখন খাযরাজ বলতে থাকে যে, অওস গোত্র এ কারণে কখনো আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারে না। তারা সেসব কাজে প্রতিযোগিতা করত যা তাদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর নিকটবর্তী করে। তখন তারা গভীর চিন্তাভাবনা করে যে, কোন সে ব্যক্তি- যে মহানবী (সা.)-এর শত্রুতায় কা'ব বিন আশরাফের সমকক্ষ হবে? তখন ইবনে আবিল হুকায়েকের কথা তাদের স্মৃতিপটে জাগ্রত হয় যে তখন খায়বারে অথবা হিজাযে বসবাস করছিল। ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন, খাযরাজ গোত্র বলে, আবু রাফে' বিন হুকায়েক গাতাফান গোত্র এবং তার আশপাশের মুশরিকদের একত্রিত করেছে আর মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অনেক বড়ো ভাতার ঘোষণা প্রদান করেছে। অতঃপর খাযরাজ গোত্র মহানবী (সা.)-এর নিকট তাকে (অর্থাৎ আবিল হুকায়েককে) হত্যা করার অনুমতি চায়। মহানবী (সা.) তাদেরকে অনুমতি প্রদান করেন। এভাবে খাযরাজের মধ্য থেকে বনু সালামার পাঁচ ব্যক্তি- আব্দুল্লাহ্ বিন আতিক, মাসউদ বিন সিনান, আব্দু ল্লাহ্ বিন উনায়স জুহনি- যিনি আনসারদের মিত্র ছিলেন, আবু কাতাদা হারেস বিন রবী এবং খাযায়ি বিন আসওয়াদ বের হন। মুহাম্মদ বিন উমর এবং ইবনে সা'দ-এর মতে, আসলাম গোত্রের আসওয়াদ বিন খাযায়ি আনসারদের মিত্র ছিল। আর বারা বিন আযেব, আব্দুল্লাহ্ বিন উতবার নামও উল্লেখ করেন যেভাবে সহীহ বুখারীতে উল্লেখিত রয়েছে। এভাবে ছয় ব্যক্তি হয়। ইবনে উকবা এবং সুহেলি আসাদ বিন হারামের নামও যোগ করেন আর এভাবে তারা সাত ব্যক্তি হলেন। মহানবী (সা.) তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আতিককে তাদের আমীর নিযুক্ত করেন আর তাদেরকে নারী ও শিশুদের হত্যা করতে বারণ করেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১০২)

দেখুন! এখানেও অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তিনি (সা.) বলেন, মহিলাদের হত্যা করবে না।

সহীহ বুখারীতে আবু রাফে'কে হত্যা করার বিস্তারিত বর্ণনা এভাবে উল্লেখ রয়েছে:

হযরত বারা বিন আযেব বর্ণনা করেন, আবু রাফে' মহানবী (সা.)-কে অনেক কষ্ট দিত আর মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে শত্রুদের সে সাহায্য করত। সে হিজাযের ভূমিতে অবস্থিত নিজ দুর্গে বসবাস করত। তারা যখন তার (অর্থাৎ আবু রাফে'র) নিকটে পৌঁছায় তখন সূর্য ডুবে গিয়েছিল। আর মানুষ নিজেদের গবাদি পশুর পাল নিয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছিল। আব্দুল্লাহ্ বিন আতিক তার সাথিদের বলেন, তোমরা নিজেদের জায়গায় অবস্থান করো, আমি যাচ্ছি; দারোয়ানের সাথে কোনো কৌশল অবলম্বন করে ভেতরে প্রবেশ করব। তিনি যান এবং দরজার কাছে পৌঁছেন। তখন তিনি নিজেকে কাপড়াবৃত করেন যেন তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিচ্ছেন। লোকজন সবাই ভেতরে ঢুকে পড়েছিল। অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে, আব্দুল্লাহ্ বিন আতিক বলেন, আমি দুর্গে প্রবেশ করার চেষ্টায় কোনো কৌশল খুঁজছিলাম; তখন দুর্গের লোকেরা বুঝতে পারে যে, তাদের একটি গাধা পাওয়া যাচ্ছে না। তখন তারা আলো নিয়ে তা খুঁজতে বের হয়। তিনি বলেন, আমার আশঙ্কা হলো, পাছে তারা আমাকে চিনে ফেলে। সেই সাহাবী বলেন, আমি আমার মাথা ঢেকে ফেলি, যেন আমি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিচ্ছি। বুখারীর বর্ণনা এটি। দারোয়ান তাকে ডেকে বলে, হে আল্লাহ্র বান্দা! তুমি যদি প্রবেশ করতে চাও তাহলে প্রবেশ করো, আমি দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছি। এরপর আমি ভিতরে ঢুকেই লুকিয়ে পড়ি। অপর একটি রেওয়ায়েতে আছে, আমি ভিতরে প্রবেশ করে দুর্গের ভেতর গাধা বাঁধার জায়গায় আত্মগোপন করি। মানুষজন যখন ভিতরে প্রবেশ করে তখন সে দরজা বন্ধ করে আর দরজার চাবি একটি পেরেকের গায়ে ঝুলিয়ে রাখে। তিনি বলেন, আমি উঠে চাবি রাখার স্থানে যাই এবং সেটি নিয়ে দরজা খুলে দিই। একটি বর্ণনায় রয়েছে, যখন সর্বত্র নিস্তব্ধতা

যুগ খলীফার বাণী

যদি তোমরা ইহকাল ও পরকালের সফলতা এবং মানুষের মন জয় করতে চাও, তবে পবিত্রতা অবলম্বন কর, নিজেকে পরিছন্ন রাখ এবং নিজের উত্তম আচরণের নমুনা প্রদর্শন কর। তবেই তোমরা সফলকাম হবে।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ১লা জানুয়ারী, ২০১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

ছেয়ে যায় এবং আমি কোনো সাড়াশব্দ টের পেলাম না– তখন বাইরে আসি। তিনি বলেন, দারোয়ান একস্থানে তাকের ওপর যখন দুর্গের চাবি রেখেছিল, আমি তা লক্ষ্য করেছি। এটিও বুখারীর বর্ণনা। মানুষ আবু রাফে'র সাথে রাতে গল্পগুজব করত। সে আসর বসাতো এবং নিজের বালাখানায় ছিল। লোকেরা যখন তার কাছ থেকে চলে গেল; [তিনি বলেন, আমি নজর রাখছিলাম, আসরে মত্ত লোকেরা যখন চলে গেল;] একটি রেওয়ায়েতে এটিও আছে যে, লোকেরা আবু রাফে'র সাথে বসে রাতের খাবার খেল এবং তারা আড্ডা জমিয়ে তুলল, এমনকি রাতের এক প্রহর অতিবাহিত হয়ে গেল, এরপর তারা নিজ নিজ গৃহে ফেরত যায়। এটিও সহীহ বুখারীর বর্ণনা। আমি তার সিঁড়ি বেয়ে উঠি আর যে দরজাই আমি খুলতাম তা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিতাম। আমি মনস্থির করলাম, মানুষ যদি আমার শব্দ টের পেয়েও যায় তবুও আমি তাকে হত্যা না করা পর্যন্ত আমার কাছে তারা পৌঁছতে পারবে না। অপর এক রেওয়ায়েতের ভাষ্য হলো, আমি তার কাছে পৌঁছলাম, অতঃপর আমি তার ঘরের দরজার দিকে গেলাম এবং সেটিকে বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলাম। এরপর একটি সিঁড়িতে উঠে আমি আবু রাফে'র নিকট পৌঁছলাম। এটিও বুখারীর বর্ণনা। তিনি বলেন, আমি দেখলাম, সে একটি অন্ধকার কক্ষে পরিবারের সাথে শুয়ে আছে। আমার জানা ছিল না, কক্ষের কোথায় সে অবস্থান করছে। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আবু রাফে'! সে বলে, কে? যে–দিক থেকে শব্দ আসে আমি অনুমান করে সেদিকে যাই। আমি তরবারি দিয়ে তাকে আঘাত করি। আর আমি ভীতত্রস্ত [অর্থাৎ উত্তেজনায় ঘাবড়ে] ছিলাম, তাই আঘাতটি তেমন জুতসই হয় নি। সে চিৎকার করে ওঠে। [সঠিকভাবে আঘাত লাগে নি আর সে চিল্লাপাল্লা আরম্ভ করলে।] তখন আমি ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আমি পুনরায় তার কাছে যাই; বুঝালাম যে, আমি তার সাহায্যের জন্য এসেছি আর বলি, আবু রাফে'! এই চেঁচামেচি কীসের? আমি আমার কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করে বলি। আবু রাফে' বলে, তুমি ধ্বংস হও! এ কক্ষে কোনো ব্যক্তি আছে যে কিছুক্ষণ পূর্বে তরবারি দিয়ে আমার ওপর আক্রমণ করেছে। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আতিক বলেন, তারপর আমি তাকে আরেকবার আঘাত করি, অর্থাৎ তার গলার শব্দ শুনে (অবস্থান আঁচ করে) তাকে আঘাত করি যা তাকে রক্তাক্ত করে দেয়। কিন্তু তখনো আমি তাকে হত্যা করতে পারি নি। এরপর তরবারির ধারালো প্রান্ত তার পেটে ঢুকিয়ে দিই, যার ফলে তা তার পিঠ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অপর একটি রেওয়ায়েতে দ্বিতীয়বার আক্রমণ করার ঘটনা এভাবে পাওয়া যায়: তারপর আমি পুনরায় তার দিকে যাই এবং তাকে আরেকবার আঘাত করি, কিন্তু তাতেও কাজ হয় নি। সে চিৎকার করল এবং তার পরিবারের লোকজন উঠে দাঁড়াল। তিনি বলেন, এরপর আমি আসি এবং আমি সাহায্যকারীর ন্যায় নিজের কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করি। [অর্থাৎ দ্বিতীয় বার কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করে যান।] দেখি যে, সে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। আমি তরবারি তার পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিই এবং তার ওপর ঝুঁকে যাই, এমনকি আমি হাড় ভাঙার শব্দশুনতে পাই। এটিও বুখারীর রেওয়ায়েত। আমি নিশ্চিত হই যে, আমি তাকে হত্যা করেছি। অতঃপর আমি একে একে দরজা খুলি, এভাবে শেষ সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছে যাই। আমি (সিঁড়িতে) আমার পা রাখলাম আর মনে করলাম, মাটি পর্যন্ত পৌঁছে গেছি, কিন্তু আমি পড়ে গেলাম। [সেটি সর্বশেষ সিঁড়ি ছিল না, বরং সম্ভবত আরো দুই–তিনটি সিঁড়ি বাকি ছিল, ফলে পড়ে গিয়ে থাকবেন।] সেই পূর্ণিমা রাতে আমার পায়ের নলা ভেঙ্গে যায়। আরেক বর্ণনায় আছে যে, আমার পায়ের অস্থিসন্ধি খুলে যায়। আমি সেটি পাগড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলি। এরপর হেঁটে গিয়ে অবশেষে দরজায় বসে পড়ি এবং ভাবতে থাকি, আজ রাতে (ততক্ষণ) বাইরে বের হব না যতক্ষণ আমি নিশ্চিত না হচ্ছি, আমি তাকে হত্যা করতে সমর্থ হয়েছি কি না? প্রভাতে যখন মোরগ ডাকল, [মোরগ যেভাবে প্রভাতে ডাকে সেভাবে ডাকা শুরু করল;] তখন মৃত্যুর ঘোষণা প্রদানকারী (ঘোষক) প্রাচীরের ওপর দাঁড়াল আর বলতে লাগল, 'হিজাযের ব্যাবসায়ীর মৃত্যুর খবর জানাচ্ছি'। তখন আমি বললাম, আমরা মুক্তি পেলাম। আল্লাহ্ তা'লা আবু রাফে'কে ধ্বংস করেছেন। এরপর মহানবী (সা.)–এর কাছে পৌঁছলাম এবং ঘটনার বিবরণ শোনালাম। তিনি (সা.) আমাকে বললেন, তোমার পা সামনে এগিয়ে দাও। আমি পা এগিয়ে দিলে তিনি (সা.) তাতে হাত বুলিয়ে দিলেন, ফলে আমার এমন মনে হলো যেন আমি কোনো ব্যথাই পাই নি। অন্য আরেক রেওয়ায়েতে রয়েছে, আব্দুল্লাহ্ বিন আতিক বর্ণনা করেছেন: আমি আমার সাথিদের কাছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এসে দাঁড়ালাম। আমি বললাম, যাও এবং (তোমরাই) রসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে সুসংবাদ দাও। কেননা আমি ততক্ষণ পর্যন্ত যেতে পারব না যতক্ষণ মৃত্যুর ঘোষণা প্রদানকারীর আওয়াজ আমার কানে এসে না পৌঁছে। সকাল হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে মৃত্যুর সংবাদবাহক দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল, 'আবু রাফে'র মৃত্যুর সংবাদ দিচ্ছি'। আব্দুল্লাহ্ বিন আতিক বলতেন, আমি যখন উঠে হাঁটা আরম্ভ করলাম তখন আমার কোনো ব্যথাই অনুভূত হচ্ছিল না। ফলে তারা মহানবী (সা.)–এর কাছে পৌঁছার পূর্বে ই আমি আমার সাথিদের ধরে ফেললাম। [অর্থাৎ এরূপ একটি বর্ণনাও রয়েছে যে, পূর্বেই তার পা মচকানোর কষ্ট দূর হয়ে গিয়েছিল।]

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস–৪০৩৯,৪০৪০)

এই ঘটনা ইমাম বুখারী হযরত বারা বিন আযেব (রা.)–র বরাতে বর্ণনা করেছেন আর এতে এ বর্ণনা রয়েছে যে, আব্দুল্লাহ্ বিন আতিক একক প্রচেষ্টায় আবু রাফে'কে হত্যা করেছিলেন; কিন্তু ইবনে উকবা, ইবনে ইসহাক, মুহাম্মদ বিন উমর এবং ইবনে সাদ প্রমুখ বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুল্লাহ্ বিন আতিকের সাথে অন্য সাথিরাও ছিল যারা সম্মিলিতভাবে (আবু রাফে'কে) হত্যা করেছিলেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১০৪–১০৫)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এই ঘটনার পর্যালোচনা করেছেন আর এটি বর্ণনা করেছেন। তিনি (রা.) লেখেন, "যে সমস্ত ইহুদী নেতার নৈরাজ্য, প্ররোচনা এবং উসকানির ফলে পঞ্চম হিজরীর শেষের দিকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিখার যুদ্ধের ন্যায় ভয়ংকর নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছিল তাদের মাঝে হুয়ী বিন আখতাব তো বনু কুরায়যার সাথে অপরাধের শাস্তি পেয়ে স্বীয় পরিণতি প্রত্যক্ষ করেছে, কিন্তু সালাম বিন আবিল হুকায়েক, যার উপনাম ছিল আবু রাফে', সে তখনও খায়বার এলাকায় লাগামহীন কার্যকলাপ ও নৈরাজ্যকর কর্ম কাণ্ডে ব্যস্ত ছিল। বরং পরিখার লাঞ্ছনাজনক ব্যর্থতা এবং বনু কুরায়যার ভয়ংকর পরিণতি তার বিদ্বেষ আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। আর যেহেতু গাতাফানের বসতি খায়বারের কাছাকাছি ছিল আর খায়বারের ইহুদী এবং নাজদের গোত্রগুলো পরস্পর প্রতিবেশী ছিল, তাই আবু রাফে'– যে অনেক বড়ো একজন ব্যাবসায়ী এবং বিরাট ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিল– সে নাজদের বর্বর ও যুদ্ধবাজ গোত্রগুলোকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উসকে দেওয়াকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করেছিল। আর রসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর শত্রুতায় সে ছিল কা'ব বিন আশরাফের পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি। অতএব সেই যুগে যার উল্লেখ করা হচ্ছে, সে গাতাফানবাসীদের প্রচুর সম্পদ দিয়ে মহানবী (সা.)–এর বিরুদ্ধে আক্রমণ করতে সাহায্য করেছিল। ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে, শাবান মাসে বনু সা'দের পক্ষ থেকে মুসলমানরা যে (হামলার) আশঙ্কা করছিল আর যা প্রতিহত করতে হযরত আলী (রা.)–র নেতৃত্বে একটি সেনাদল মদীনা থেকে যাত্রা করেছিল– সেটির নেপথ্যেও খায়বারের ইহুদীদের হাত ছিল যারা আবু রাফে'র নেতৃত্বে এ দুষ্কৃতি করে যাচ্ছিল। কিন্তু আবু রাফে' কেবল এতেই ক্ষান্ত হয় নি। মুসলমানদের রক্ত দিয়ে সে তার অতৃপ্ত পিপাসা নিবারণ করতে চাইত, তাছাড়া মহানবী (সা.)–এর সত্তা ছিল তার চক্ষুশূল। যাহোক, পরিশেষে সে ষড়্ যন্ত্রমূলকভাবে পরিখার যুদ্ধের ন্যায় নাজদের গোত্র গাতাফান এবং অন্যান্য গোত্রগুলোর মাঝে পুনরায় সফর করা শুরু করে আর মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার জন্য বিরাট এক সেনাদল একত্রিত করা শুরু করে।" [উহুদের যুদ্ধের পর সে পুনরায় আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে একটি দল গঠন করা শুরু করে।]

"অবস্থা যখন এই পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয় আর মুসলমানদের সম্মুখে সেই আহযাবের দৃশ্য ভেসে ওঠে তখন খাযরাজ গোত্রের কতিপয় আনসার সাহাবী মহানবী (সা.)–এর সমীপে উপস্থিত হয় আর নিবেদন করে, এই নৈরাজ্য নির্মূলের ক্ষেত্রে যে–কোনো উপায়ে এই নৈরাজ্যের মূল হোতা আবু রাফে'কে হত্যা করা ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। [এটিই একমাত্র উপায়।] মহানবী (সা.) ভাবলেন, দেশে ব্যাপক রক্তারক্তি ও খুনোখুনির বদলে এক নৈরাজ্যবাদী ব্যক্তির নিহত হওয়া অধিক সমীচীন। ফলে এ সাহাবীদের তিনি (সা.) অনুমতি প্রদান করেন। আর আব্দুল্লাহ্ বিন আতিক আনসারী সাহাবীর নেতৃত্বে চারজন খাজরাযী সাহাবীকে আবু রাফে'র উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। কিন্তু যাত্রাকালে তাদেরকে কড়া নির্দেশনা দিয়ে বলেন, সাবধান! কোনো নারী বা শিশুকে কোনো অবস্থাতেই হত্যা করবে না। [পুনরায় এ বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছেন। সেক্ষেত্রে এ কথা কীভাবে বিশ্বাসযোগ্য যে, সেখানে মহিলাকে হত্যা করেছেন?]। ৬ষ্ঠ হিজরী সনের রমযান মাসে এই দল যাত্রা করে আর অতি সাবধানতার সাথে নিজেদের কার্য সম্পাদন করে ফিরে আসে। এভাবে এই নৈরাজ্যের মেঘমালা মদীনার আকাশ থেকে দূরীভূত হয়। এই ঘটনাটি বিস্তারিত বিবরণ বুখারীতে

যুগ ইমামের বাণী

সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে সর্বোত্তম পন্থায় ঋণ পরিশোধ করে। (সহী মুসলিম, কিতাবুল মাসাকাত)

দোয়াপ্রার্থী: Jahan ara Begum, Bhagwangola, Murshdabad

রয়েছে যা সবচেয়ে সঠিক রেওয়ায়েত। পূর্বেও আমি তা শুনিয়েছি, এটি তিনি নিজের মতো করে এখানে বর্ণনা করেছেন।বারা বিন আযেব বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) নিজ সাহাবীদের একটি দল ইহুদী আবু রাফে'র উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। আব্দুল্লাহ্ বিন আতিক আনসারীকে তাদের দলপতি নিযুক্ত করে দেন। আবু রাফে'র বিষয়টি হলো, সে মহানবী (সা.)-কে ভীষণ কষ্ট দিতো। আর তাঁর বিরুদ্ধে মানুষকে উসকানি দিতো এবং তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করতো। যখন আব্দুল্লাহ্ বিন আতিক এবং তার সঙ্গীগণ আবু রাফে'র দুর্গের নিকট পৌঁছলেন, তখন সূর্য অস্তমিত হলো। আব্দুল্লাহ্ বিন আতিক (রা.) নিজ সঙ্গীদেরকে রেখে নিজে দুর্গের দরজার নিকট আসলেন এবং সেখানে এমনভাবে চাদরমুড়ি দিয়ে বসে পড়লেন যেন কোনো ব্যক্তি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার জন্য বসেছে। যখন দুর্গের ফটকের দারোয়ান দরজার নিকট এলো তখন আব্দুল্লাহ্ বিন আতিককে দেখে বললো, ওহে! আমি এখন দুর্গের ফটক বন্ধ করে দেবো, তুমি ভেতরে প্র বেশ করতে চাইলে দ্রুত প্রবেশ করো। আব্দুল্লাহ্ বিন আতিক ভালোভাবে চাদরমুড়ি দিয়ে ফটক পেরিয়ে দ্রুত দুর্গে প্রবেশ করেন এবং একপাশে আত্মগোপন করেন। আর ফটকের দারোয়ান ভেতর থেকে ফটক বন্ধ করে সেটির চাবি কাছাকাছি একটি আংটাতে ঝুলিয়ে রেখে চলে যায়। (আব্দুল্লাহ্ বিন আতিক স্বয়ং বর্ণনা করেন,) এরপর আমি আমার লুকানোর স্থান থেকে বেরিয়ে পড়ি এবং সবার আগে আমি দুর্গের ফটকটি খুলে দেই যেন প্রয়োজনের সময় দ্রুত এবং সহজেই বেরিয়ে আসা যায় সম্ভব হয়। সেই সময় আবু রাফে' একটি বালাখানায় অবস্থান করছিল। [উপরে তার ঘরের মেঝেতে বসে ছিল, কামরায় ছিল;] এবং তার আশেপাশে অনেক লোক আসর জমিয়ে বসে ছিল আর পরস্পর আলাপচারিতায় মত্ত ছিল। যখন এরা উঠে চলে গেল এবং নীরবতা ছেয়ে গেল তখন আমি আবু রাফে'র বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে ওপরের তলায় উঠে গেলাম এবং অধিক সতর্কতাবশত পথিমধ্যে যে দরজাই পাচ্ছিলাম, ভেতরে প্রবেশ করে ভেতর থেকে বন্ধ করে দিচ্ছিলাম। যখন আমি আবু রাফে'র কক্ষে পৌঁছলাম, তখন সে প্রদীপ নিভিয়ে ঘুমানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল আর কক্ষটি একেবারে অন্ধকার ছিল। আমি উচ্চৈঃস্বরে আবু রাফে'কে ডাকলাম। এর উত্তরে সে বললো, কে? তার কণ্ঠস্বরের দিকটি অনুমান করে সেদিকে ছুটে যাই এবং তরবারি দিয়ে মারাত্মক এক আঘাত করি। কিন্তু ঘুটঘুটে অন্ধকার ছিল আর সেই সময় আমি বিচলিত ছিলাম, তাই তরবারির আঘাত সঠিক জায়গায় লাগে নি। তখন আবু রাফে' চিৎকার করে ওঠে। এতে আমি কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ পর আমি পুনরায় কক্ষের ভেতরে প্রবেশ করে নিজের গলার স্বর পরিবর্তন করে জিজ্ঞেস করলাম, আবু রাফে'! এটা কীসের শব্দ? সে আমার পরিবর্তিত গলার স্বর চিনতে না পেরে বললো, তোমার মরণ হোক! এইমাত্র কেউ আমার ওপর তরবারি দিয়ে আক্রমণ করেছে। আমি আওয়াজ শুনে পুনরায় তার দিকে ছুটলাম এবং তরবারি দিয়ে আক্রমণ করলাম। এইবার আঘাত মোক্ষম ছিল, কিন্তু তবুও সে মারা গেল না। তখন আমি তার ওপর তৃতীয়বার আক্রমণ করে তাকে হত্যা করলাম। এরপর আমি দ্রুত একের পর এক দরজা খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। কিন্তু যখন আমি সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছিলাম তখন কয়েক ধাপ অবশিষ্ট ছিল; আমি ভেবেছিলাম, আমি সব ধাপ নেমে গেছি, ফলে আমি অন্ধকারে পড়ে গেলাম। বেকায়দায় পা পড়ল এবং আমার পায়ের নলা ভেঙে গেল। একটি রেওয়াতে বর্ণিত হয়েছে, নলার অস্থিসন্ধি বেরিয়ে আসলো। আমি সেটিকে পাগড়ি দিয়ে বেঁধে পা হেঁচড়ে বেরিয়ে আসলাম, কিন্তু আমি মনে মনে বললাম, যতক্ষণ পর্যন্ত আবু রাফে'র মৃত্যুর বিষয়ে নিশ্চিত না হচ্ছি আমি এখান থেকে যাব না। আমি দুর্গের পাশেই এক স্থানে লুকিয়ে বসে পড়লাম। যখন ভোর হলো তখন দুর্গের ভেতর থেকে কারো আওয়াজ আমার কানে আসলো, হিজাযের ব্যাবসায়ী আবু রাফে' মৃত্যু বরণ করেছে।

এরপর আমি উঠলাম এবং ধীর পদক্ষেপে নিজ সঙ্গীদের সাথে মিলিত হলাম। অতঃপর আমরা মদীনাতে এসে মহানবী (সা.)-কে আবু রাফে'র নিহত হবার সংবাদ দিলাম। তিনি (সা.) পুরো ঘটনা শুনে আমাকে বললেন, নিজ পা সামনে বাড়াও। আমি পা বাড়ালে তিনি (সা.) দোয়া করে নিজের হাত বোলালেন, এরপর আমার মনে হলো, আমি যেন কোনো আঘাতই পাই নি।

অপর একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যখন আব্দুল্লাহ্ বিন আতিক (রা.) আবু রাফে'র ওপর আক্রমণ করলেন তখন তার স্ত্রী জোরে চিৎকার দেওয়া শুরু করে। এতে আমার আশঙ্কা হয়, তার চিৎকার শুনে আবার অন্য লোকেরা সতর্ক না হয়ে পড়ে। এতে আমি তার স্ত্রীর ওপর তরবারি দিয়ে আক্রমণ করতে উদ্যত হলে মহানবী যে নারীদের হত্যা করতে নিষেধ করেছেন সেকথা আমার মনে পড়ল। [এখানেও একই কথা হচ্ছে যে, নারীদের হত্যা করা নিষেধ।] তিনি বলেন, সেজন্য আমি তরবারি দিয়ে আঘাত করি নি, অথচ খুবই বিপজ্জনক পরিস্থিতি ছিল।

আবু রাফে'র হত্যার বৈধতার বিষয়ে আমাদের এখানে কোনো বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই।

আবু রাফে'র রক্তক্ষয়ী কর্ম কাণ্ড ইতিহাসের এক উন্মুক্ত অধ্যায়। নীতিগতভাবে এতটুকু মনে রাখা উচিত:

১. সে সময় মুসলমানরা অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় সর্বমুখী বিপদে পরিবেষ্টিত ছিল। সকল দিকে বিরোধীতার আগুন প্রজ্বলিত ছিল। পুরো দেশ যেন মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য সম্মিলিত হচ্ছিল।

২. এমন স্পর্শকাতর পরিস্থিতিতে আবু রাফে' মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রজ্বলিত আগুনে ঘি ঢালছিল। নিজের প্রভাব, প্রতিপত্তি ও অর্থসম্পদ দ্বারা আরবের বিভিন্ন গোত্রকে ইসলামের বিরুদ্ধে উসকে দিচ্ছিল। এই বিষয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিল, আরবের হিংস্র গোত্রগুলো যেন আহযাবের যুদ্ধের মতো সংঘবদ্ধভাবে পুনরায় মদীনার ওপর আক্রমণ করে।

৩. সে সময় আরবে কোনো নিয়মতান্ত্রিক সরকার ছিল না যাদের কাছে সাহায্য চাওয়া যেত। বরং প্রত্যেক গোত্র নিজ স্থানে স্বাধীন ও সার্বভৌম ছিল। সেজন্য নিজ নিরাপত্তার জন্য নিজের পক্ষ থেকে পদক্ষেপ নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

৪. ইহুদীরা পূর্ব থেকেই ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ ছিল এবং ইহুদীদের ও মুসলমানদের মাঝে যুদ্ধের অবস্থা বিরাজমান ছিল।

৫. সে সময় পরিস্থিতি এমন ছিল যে, ইহুদীদের বিরুদ্ধে যদি প্রকাশ্যে সৈন্য পরিচালনা করা হতো তাহলে প্রাণ ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হতো এবং যুদ্ধের আগুন সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে দেশব্যাপী ভয়ানক ধ্বংসযজ্ঞের আশঙ্কা ছিল।

এহেন পরিস্থিতিতে সাহাবায়ে কেরাম যা করেছেন তা ছিল একেবারে সঠিক। যুদ্ধের পরিস্থি তিতে যখন একটি জাতি জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন এই ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা একেবারেই বৈধ মনে করা হয়। পৃথিবীর প্রতিটি জাতি প্রয়োজন অনুযায়ী প্রত্যেক যুগে এমন পন্থা গ্রহণ করেছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, বর্তমান নৈতিক অবক্ষয়ের যুগে অপরাধীর প্রতি সহানুভূতি এতটাই অবৈধ সীমা পর্যন্ত পোঁছে গেছে যে, একজন নিষ্ঠুর ব্যক্তিও নায়ক হয়ে যায়। [আজও আমরা দেখি, স্বৈরশাসকও বীরে পরিণত হয়ে আছে এবং অপরাধী অপরাধের জন্য যে শাস্তি পাওয়া দরকার তা না পেয়ে মানুষের সহানুভূতি পেতে থাকে।] অন্যায়কারীর শাস্তির কথা বললে কিছু স্বার্থপর মানুষ তার পক্ষ অবলম্বন করে, তার অপরাধ মানুষ ভুলে যায়। কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে আমরা জানি, ইসলাম এই ধরনের মিথ্যা আবেগ-অনুভূতির সমর্থক ধর্ম নয়। ইসলাম অপরাধীকে অপরাধী হিসেবেই আখ্যায়িত করে আর তাকে শাস্তি দেওয়া দেশ ও সমাজের জন্য মঙ্গলজনক মনে করে। ইসলাম শরীর থেকে একটি রোগাক্রান্ত অঙ্গ কেটে ফেলার শিক্ষা দেয় এবং একটি অসুস্থ অঙ্গ আরেকটি সুস্থ অঙ্গকে স্পর্শ করে কলুষিত করবে- এর অনুমতি ইসলাম দেয় না।

বাকি রইল শাস্তি প্রদানের রীতি সম্পর্কিত প্রশ্ন; তৎকালীন আরবদের অবস্থার প্রেক্ষিতে এবং তৎকালীন মুসলিম ও ইহুদীদের মধ্যে যে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছিল সে প্রেক্ষিতে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল, যা সামগ্রিক শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যথোপযুক্ত ছিল।

আবদুল্লাহ্ বিন আতিকের পায়ের নিরাময় সম্পর্কে বুখারীর রেওয়ায়েতে ব্যাখ্যা করা হয় নি যে, এই নিরাময় কি অলৌকিকভাবে তৎক্ষণাৎ হয়েছিল নাকি স্বাভাবিক ভাবে ধীরে ধীরে তা নিরাময় হয়েছিল। যদি দ্বিতীয়টি ঘটে থাকে তাহলে এটি একটি সাধারণ ঘটনা বলে বিবেচিত হবে; সেক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর দোয়ার প্রভাব এটি সাব্যস্ত হবে যে, তাঁর (সা.) দোয়ার বরকতে এই আঘাত কোনো দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি করে নি এবং এর ফলে কোনো খারাপ ফলাফল প্রকাশ পায় নি; বরং হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.)-র পা অবশেষে পূর্ণশক্তি ফিরে পেয়েছে এবং আঘাতের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে গেছে। তবে এই নিরাময়টি যদি অলৌকিক এবং তাৎক্ষণিকভাবে ঘটে থাকে তবে অবশ্যই এই ঘটনাটি খোদা তা'লার বিশেষ তকদীরের (বা মু'জিযার) দৃষ্টান্ত ছিল যা তিনি নিজ রসূলের (সা.) দোয়ার বরকতের ফলে প্রকাশ করেছেন।"

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ: ৭২১-৭২৫)

যাহোক, এগুলো ছিল তার ঘটনা এবং ভবিষ্যতে ইনশাআল্লাহ্ আরো ঘটনা উল্লেখ করা হবে।

****

যুগ খলীফার বাণী

জাগতিক কামন-বাসনা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এটি এড়িয়ে চলা আবশ্যক।

(খুতবা জুমআ, ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam Master, Nararvita (Assam)

তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়কে 'খোলা ও তালাক' পর্যন্ত গড়িয়ে নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত ভয়াবহ ও জঘন্য পন্থা

প্রদত্ত খুতবা ২১ শে জুন, ১৯৪৬

তাশাহুদ, তাউয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর বলেন: "মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশের মধ্যে দাম্পত্য-জীবন অন্যতম। পার্থিব জীবনের জন্য মানুষের জন্য যে সকল বিষয় অপরিহার্য এবং যেগুলির মাধ্যমে মানুষ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করতে পারে সেটা হল দাম্পত্য সম্পর্ক। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মাধ্যমে যে সুখ ও শান্তি মানুষ লাভ করে তা অন্য কোনও মাধ্যমে লাভ হতে পারে না। কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা এদেরকে একে অপরের জন্য শান্তি ও স্বস্তির মাধ্যম হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। অনুরূপভাবে বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা আদমের জন্য হাওয়া'-কে সৃষ্টি করেছেন, যাতে সে আদমের সুখ ও স্বস্তির কারণ হয়। অর্থাৎ হাওয়া ছাড়া আদমের সুখ-স্বাচ্ছন্দের অন্য কোনও পরিস্থিতি ছিল না। ..... হাজার হাজার স্বামী এমন আছে যারা নিজেদের স্ত্রীদের জন্য নিকৃষ্ট আযাব প্রমাণিত হয়। পক্ষান্তরে হাজার হাজার স্ত্রী এমন আছে যারা নিজেদের স্বামীর জন্য নিকৃষ্ট আযাব প্রমাণিত হয়। ইসলাম এমন পরিস্থিতিতে আমাদের জন্য এমন উৎকৃষ্টমানের দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছে যে, বস্তুত এই সকল আদেশের উপস্থিতিতে আমাদের জন্য ভয় পাওয়ার এবং উদ্বেগের কোনও কারণ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল, ইসলামের শিক্ষার উপর আমল করার জন্য কতজন প্রস্তুত হয়? অমুসলিমরা তো আগে থেকেই ইসলামের শিক্ষার উপর আপত্তি করার জন্য তৈরী হয়ে বসে আছে। এমনকি যে সকল মুসলমান ইসলামের শিক্ষা মেনে চলে, তারাও ইসলামের শিক্ষা থেকে অনেক দূরে পড়ে আছে। আর কুরআন করীমের দিকে আসা মোটেই পছন্দ করে না। বরং ইসলামের বাইরে আদালতের মাধ্যমে নিজেদের বিচার করাতে চায়। যদি কোনও দম্পতির মাঝে কলহ সৃষ্টি হয় আর তাদেরকে বলা হয় যে, কুরআন করীমের শিক্ষা অনুযায়ী এই কলহের নিরসন করার চেষ্টা কর, তখন তাদের আত্মীয়-স্বজনেরা এই বিষয়ে অনাধিকার হস্তক্ষেপ করে বসে এবং বলতে শুরু করে যে, এইসব কথা মেনে কোথাও কোনও উপকার হয়েছে?আমরা কিভাবে এগুলো অনুসারে বিচার করব? তাদের কাছে যেন কুরআন করীম কল্পকাহিনীর এক গ্রন্থ, যেটা গ্রন্থাগারের শ্রীবৃদ্ধির জন্য রাখা উচিত। কিন্তু এর উপর আমল করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি এমনটি মনে করে যে, কুরআন করীমের শিক্ষা পালনযোগ্য নয়, এমমন ব্যক্তি ইসলামের গন্ডিতে কেনই বা থাকে? এমন ব্যক্তির উচিত ইষলাম ত্যাগ করা এবং অন্য কোন ধর্ম সন্ধান করা যার শিক্ষা তার কাছে পালনযোগ্য বলে মনে হয়, যাতে অন্তত বিবেকটুকু স্বাধীনতা পায়। সে যখন ইসলামের শিক্ষাকে ভ্রান্ত ও অপছন্দনীয় মনে করছে,তখন সে নিজের বিবেককে কেন হত্যা করছে? তাকে কেন ধরে রেখেছে, ছেড়ে দিচ্ছে না কেন?

আমি জামাতের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, আমাদের জামাতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ পূর্বের থেকে বেশি সৃষ্টি হচ্ছে। ঝগড়া তৈরী হওয়া মন্দ নয়, কেননা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মাঝে মধ্যে মনোমালিন্য তৈরী হওয়া মানুষের সহজাত গুণ। কিন্তু মনোমালিন্য তৈরী হওয়ার পর ইসলামী শিক্ষাকে এড়িয়ে যাওয়া ভীষণ খারাপ ব্যপার। আমি দেখেছি, মানুষ সাধারণত এমন পরিস্থিতিতে ইসলামের শিক্ষা বর্জন করে অন্যায়ের শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যায় আর ইসলামের শিক্ষাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে। আমার জন্য এমনটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আমাদের জন্য রসুল করীম (সা.)-এর পরিপূর্ণ আদর্শ রয়েছে। আমরা দেখতে পাই যে, তিনি কেবল একজন স্বামী ছিলেন না, বরং তিনি নবীও ছিলেন, পীরও ছিলেন, প্রভু ছিলেন। কিন্তু সেই সব কিছু সত্ত্বেও তিনি তাঁর এক সহধর্মিনীকে একটি গোপন কথা বললেন এবং আদেশ করলেন যে, একথা যেন অন্য কাউকে না বলে।কিন্তু তাঁর সেই স্ত্রী নিজের কিছু বান্ধবীদের, যাঁরা রসুলুলুল্লাহ্ (সা.)-এর স্ত্রী-ই ছিলেন, সেই গোপন কথাটি বলে দেন। আল্লাহ্ তা'লা আঁ হযরত (সা.)-কে ইলহামের মাধ্যমে জানিয়ে দেন যে, আপনার সেই স্ত্রী সেই গোপন কথাটি আপনার অন্যান্য কতিপয় স্ত্রীদের সামনে প্রকাশ করে দিয়েছেন। এত রসুল করীম (সা.) তাঁকে সতর্ক করার সিদ্ধান্ত নেন এবং বলেন, 'আমি মসজিদেই থাকব আর বাড়িতে স্ত্রীদের কাছে যাব না। তিনি মসজিদ তাঁবু স্থাপন করার নির্দেশ দিলেন। তাঁর আদেশে মসজিদে তাঁবু স্থাপন করা হল; তিনি সেখানে থাকতে শুরু করলেন। মক্কাবাসীরা নিজেদের স্ত্রীদের প্রতি কোমল আচরণ করত না। বরং যেভাবে পাঞ্জাবীরা স্ত্রীদের সংশোধনের জন্য একটা চিকিৎসা জানে- স্ত্রীদের লাঠি-পেটা করে সোজা করা। অনুরূপভাবে মক্কাবাসীরা স্ত্রীদের প্রতি অনমনীয় আচরণ করত। তাদের স্ত্রীদের সাহস ছিল না কোনও বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার কিম্বা পুরুষদের সামনে মুখ খোলার। মদিনায় মক্কার তুলনায় মহিলারা কিছুটা বেশি স্বাধীনতা উপভোগ করত। যদিও আল্লাহ্ তা'লা রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাধ্যমে মহিলাদের যে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, তা পূর্বের স্বাধীনতার থেকে আরও বেশি উদার ছিল। যাইহোক, মদিনার মহিলারা কখন সখনও স্বামীদের সামনে কথা বলার সুযোগ পেত। কিন্তু মক্কাবাসীদের স্ত্রীদের জন্য কঠিনতা পুরোদস্তুর অব্যাহত ছিল। যখন রসুলুল্লাহ্ (সা.) মসজিদে নিজের অবস্থাপন পাকা করে ফেললেন, তখন সাহাবাগণের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হল যে, আঁ হযরত (সা.) হয়তো তাঁর স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন। তাই এক সাহাবী ভয়ে ভয়ে হযরত উমর (রা.)-এর কাছে পৌঁছন, যিনি মদিনা থেকে দুই-তিন মাইল দূরত্বে একটি গ্রামে বাস করতেন। হযরত উমর (রা.) বললেন, সেই সময় আমাদের বাসস্থানের অভাব ছিল,তাই আমরা প্রতিদিন রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর মজলিসে উপস্থিত হতে পারতাম না। আমরা পালা নির্ধারণ করে রেখেছিলাম। একজন সঙ্গী যেত,সে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহচর্যে সারাদিন থাকত আর মহানবী (সা.)-এর সমস্ত কথা শুনত। সন্ধ্যায় ফিরে এসে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর মজলিসের সমস্ত কথা আমাদের শোনাত। যেদিন এই ঘটনাটি ঘটে সেই দিন হযরত উমর (রা.)-এর সঙ্গীর পালা ছিল। তিনি মদিনা থেকে ফিরে গিয়ে হযরত উমরকে বললেন, উমর! তুমি কি জান মদিনায় কি ঘটেছে? হযরত উমর (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে? তাঁর সঙ্গী উত্তর দিলেন, রসুলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর সকল স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন। তাঁর একথা শুনে হযরত উমর (রা.) ভীষণ ভয় পেয়ে যান। কেননা রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বিবাহ বন্ধনে হযরত উমর (রা.)-এর কন্যা হাফসা (রা.)ও ছিলেন। হযরত উমর (রা.) মদিনায় গিয়েই হযরত হাফসার ঘরে প্রবেশ করেন। তিনি যখন পৌঁছলেন, তখন হযরত হাফসা বসে কাঁদছিলেন। হযরত যেতেই হযরত হাফসাকে বললেন, নির্বোধ! আমি তোমাকে কি এই বলে নিষেধ করতাম না যে, তুমি রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সম্মান করবে আর আয়েশাকে অনুকরণ করবে না। আয়েশা মর্যাদা ভিন্ন আর তোমার মর্যাদা ভিন্ন। কিন্তু তুমি আমি আমার কথা শোন নি। এখন পরিণাম প্রকাশ পেয়েছে। এরপর তিনি হযরত হাফসাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, একথা কি সত্য যে রসুলুল্লাহ্ (সা.) সকল স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন?হযরত হাফসা বললেন, না, তালাক তো দেন নি। তবে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে চলে গিয়েছেন। হযরত উমর (রা.) সেখান থেকে বের হয়ে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন এবং ভিতরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করেন। রসুলে করীম (সা.) তাঁকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দান করেন আর তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি ভিতরে গিয়ে দেখলাম আঁ হযরত (সা.) একটি মাদুরের উপর শুয়ে আছেন। আর মাদুরটি অত্যন্ত অমসৃণ ছিল। আমি প্রবেশ করাতে তিনি উঠে বসলেন। তাঁর পুরো শরীরে মাদুরের দাগ বসে গিয়েছিল। আমি বললাম, হে রসুলুল্লাহ! সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সমস্ত উপকরণ রোমান ও পারস্য সম্রাটের কাছে, তারা অত্যন্ত বিলাসিতার জীবন যাপন করছে। অথচ আপনার কাছে কোনও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ নেই। আপনার কাছে আছে কেবল

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে এবং অনুধাবন করে, সে ধনী; তার কোনও দারিদ্রের ভয় নেই।

(সুনান সাঈদ বিন মনসুর)

দোয়াপ্রার্থী: **Wasia Begum, Harhari, Murshidabad**

যুগ খলীফার বাণী

খিলাফত এবং জামাতের সঙ্গে যারা সম্পর্ক স্থাপন করে, আল্লাহ তা'লা তাদের পথ-প্রদর্শন করেন।

-খুতবা জমা ২৪ মে ২০১৯

দোয়াপ্রার্থী: **Noor Jahan Begum, Kolkata**

এই মাদুরুখানি, যার দাগ আপনার সমস্ত শরীরে বসে গেছে। হযরত উমর (রা.) বলেন, এই কথাগুলি আমি ইচ্ছাকৃতভাবে বলেছিলাম, যাতে তাঁর মনে কোন ক্ষোভ থাকলে তা যেন দূর হয়ে যায়। আমার কথা শুনে তিনি হেসে ফেললেন। আমি এই সুযোগে নিবেদন করলাম, হে রসুলুল্লাহ! একথা কি সঠিক যে, আপনি আপনার সমস্ত স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন? তিনি (সা.) বলনে, না, তালাক তো দিই নি। এরপর হযরত উমর (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি তো হাফসাকে বোঝাতে থাকি, সে যেন আয়েশার অনুকরণ না করে আর আপনাকে অনেক সম্মান করে। হে রসুলুল্লাহ্! আপনার কাছে একথা গোপন নয় যে, মক্কাবাসীদের সামনে তাদের স্ত্রীরা মুখ খুলত না। একদিন কোনও এক বিষয়ে আমার স্ত্রী আমাকে পরামর্শ দিতে শুরু করে। আমি তখন তাকে বললাম, তুমি নিজের মর্যাদা ভুলে যেও না। তুমি আমাকে পরামর্শ কিভাবে দিতে পার? কিন্তু আমাদের স্ত্রীদেরকেও মদিনারা মহিলার ধীরে ধীরে বিগড়ে দিয়েছে। একদিন আমি কথা বলছিলাম, এরই মাঝে আমার স্ত্রী আমাকে কোনও একটি বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করে। আমি যখন তাকে বাধা দিলাম, তখন সে উত্তর দিল, রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর ঘরে তাঁর স্ত্রীরা তাঁকে পরামর্শ দেন। তুমি আমাদেরকে বাধা দেওয়ার কে? এইভাবে হযরত উমর (রা.) অত্যন্ত সুকৌশলে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেন যে, আপনিই মহিলাদেরকে এই স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন। তাদের যদি কোনও ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে, তবে তারা ক্ষমা পাওয়ার অধিকার রাখে। কিন্তু এই সব কিছু সত্ত্বেও রসুল করীম (সা.) মহিলাদের অধিকারসমূহ উৎকৃষ্ট পন্থায় রক্ষা করেছেন। এমনকি তিনি নিজের শেষ ভাষণেও এই উপদেশই দান করেছেন যে, নিজেদের স্ত্রীদের প্রতি সদয় আচরণ করবে আর ক্রীতদাসদের প্রতি ভ্রাতৃসুলভ আচরণ করবে, তাদের দ্বারা কাজ নিবে না যা তাদের সামর্থের বাইরে।

যাইহোক ইসলাম মহিলাদের অধিকারসমূহকে যেভাবে রক্ষা করেছে তা অন্য কোন ধর্ম করে নি। কিন্তু যেহেতু মানুষ এমন এক সৃষ্টি যার মধ্যে বিভিন্ন ধরণের কামনা-বাসনা ও স্বভাব বিদ্যমান। এই কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মাঝে মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়;তাদের সম্পর্ক আগাগোড়া এক সমান থাকতে পারে না। এই মতানৈক্য যদি তীব্র রূপ ধারণ করে, তবে সেক্ষেত্রে ইসলামের আদেশ হল পুরুষ তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিক বা স্ত্রীকে স্বামীর কাছ থেকে 'খুলা' গ্রহণ করুক। কিন্তু তালাক ও খুলার পূর্বে কিছু বিধিনিষেধ বর্ণিত হয়েছে, যেগুলি দৃষ্টিপটে রেখে পালন করা পুরুষ, মহিলা ও কাজির জন্য আবশ্যক, যাতে তালাক ও খুলা বহুল প্রচলিত হয়ে দাঁড়ায়। রসুল করীম (সা.) বলেন, إِنَّ أَبْغَضَ الْحَلَالِ عِنْدَ اللهِ الطَّلَاقُ অর্থাৎ হালাল বিষয়সমূহের মধ্যে আল্লাহ্ তা'লার নিকট সর্বাধিক অপছন্দনীয় বিষয় হল তালাক। আল্লাহ্ তা'লার নিকট সর্বাধিক অপছন্দনীয় বিষয় যেহেতু তালাক, সেখানে একজন মোমেন, যে কি না আল্লাহ্ তা'লাকে ভালবাসে, সে কিভাবে এমন বিষয়ে নিকট যেতে পারে যার সম্পর্কে সে জানে যে আল্লাহ্ তা'লা সেটা ভীষর্ণভাবে অপছন্দ করেন। প্রতিটি বৈধ কাজ আবশ্যিকভাবে করণীয় নয়। তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই জানে যে, বানারস, কোলকাতা, মাদ্রাস বা বুম্বাই যাওয়া বৈধ। কিন্তু কতজন আছে যারা এই সব জায়গায় গেছে? যদি হালাল-এর অর্থ এটাই হয় যে, সেটা অবশ্যই করতে হবে, তবে এমনটি হওয়া উচিত ছিল যে, যাদের কাছে এই সব শহরগুলিতে যাওয়ার অর্থ ছিল না, তারা নিজেদের সম্পত্তি বিক্রি করে এই আবশ্যিক কর্মটি সম্পন্ন করত। কিন্তু লোকে যেহেতু এমনটি করছে না, তাই বলা যায় যে, তারা মনে করে, যে কাজ বৈধ, তা আবশ্যিকভাবে করণীয় নয়। স্থান-পাত্র-কালকেও বিবেচনা করা আবশ্যক। একটা হালাল কাজ করতে গিয়ে যদি তিক্ত অভিজ্ঞতার কোন উপকরণ সৃষ্টি হয়ে যায়, তবে এমন কাজ করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকা উচিত। যেমন- পেঁয়াজ খাওয়া হালাল। কিন্তু পেঁয়াজ খেয়ে মসজিদে যাওয়া নিষেধ। কেননা সেখানে মানুষের এর গন্ধে কষ্ট হয়। অনুরূপভাবে সবুজ, হলুদ বা বেগুনি রঙের কাপড় পরা মানুষের জন্য বৈধ। যদি কারোর বন্ধু বলে, এই হলুদ রঙের পোশাকটি কিনে নাও, তখন সে বলে, হলুদ রঙ হলুদ রঙ আমার পছন্দ নয়। এখন তার কাছে হালাল জিনিস সেটা যা তার কাছে পছন্দের এবং তার রুচিবোধ সম্মত। খাদ্য সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ, হালাল ও রুচিসম্মত খাও। কেউ কেউ বেগুন খায় না। কেউ আবার কুমড়ো পছন্দ করে না। বেগুন কেন খাও না? এমন কথা জিজ্ঞাসা করা হলে তাদের উত্তর দেয়, আমার ভাল লাগে না। অথবা অন্য কোনও ব্যক্তি যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, আপনি কুমড়ো কেন খান না? সে উত্তর দিবে, আমার স্ত্রীর এটা পছন্দ নয়। অনুরূপভাবে মানুষ যখন বাড়ি তৈরী করে, তখন সে নিজের রুচি ও পছন্দ অনুসারে তৈরী করে। কেউ একতল বাড়ি তৈরী করে, কেউ দ্বিতল বা ত্রিতল বাড়ি তৈরী করে। কেউ বাগানযুক্ত বড়ি পছন্দ করে আবার কেউ বাগানহীন। এগুলি সবই বৈধ বা হালাল, কিন্তু মানুষ সবগুলিই গ্রহণ করে না। যার অর্থ হল, মানুষ মনে করে, প্রত্যেক হালাল বা বৈধ বিষয় পালন করা আবশ্যক নয়। কিন্তু যখন স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার প্রসঙ্গ আসে, তখন সে বলে, স্ত্রীকে তালাক দেওয়া বৈধ; আর তৎক্ষণাৎ অবিবেচকের মত তালাক দিয়ে বসে। অথচ মানুষ সব সময় নিজের, কিছু বন্ধু-বান্ধব এবং সমাজের কারণে অনেক কিছু হালাল বিষয়ও ত্যাগ করে থাকে। বস্তুত এমন পরিস্থিতিতে একজন মোমেনের অবস্থা এই হয় যে, সেই বৈধ বিষয়টিকে খোদার কারণে ত্যাগ করে দেয় আর এবং মনে করে যে, যেহেতু আমার এই কাজ খোদার নিকট পছন্দনীয় নয়, অতএব, আমি এই কর্মটি করছি না, যাতে আমার খোদা আমর উপর অসন্তুষ্ট না হন।

অতএব, তালাককে বহুল প্রচলিত বিষয়ে পরিণত করা হেদায়াতের পথ নয়,বরং তালাক থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করাই হল হেদায়াতের পথ। হালালের অর্থ হল, চাইলে করতে পার। বিধানের দিক থেকে নিষেধ নয়। কিন্তু তোমাদেরকে অন্যদের আবেগ অনুভূতি, তাদের প্রতি সহানুভূতি ও ভালবাসাকেও দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। যে বৈধ কর্ম করার পরিণতিতে অন্যদের ভাবনা, আবেগ-অনুভূতি এবং অন্যদের প্রতি সহানুভূতি ও ভালবাসার মৃত্যু হয়, সেই কর্ম বৈধ নয়। বরং এমন হালাল একদিক থেকে হালাল হলেও অপরদিক থেকে হারাম বা অবৈধ। মানুষ যখন নিজের বন্ধু-বান্ধব, সমাজ ও জাতির ক্ষোভের প্রতি যত্নবান হয়,তখন কি মানুষকে কি খোদা তা'লার অপ্রীতিভাজন হওয়ার বিষয়ে বেপরোয়া উচিত? খোদা তা'লার সত্তা কি এতই দুর্বল যার অসন্তুষ্টি মানুষের ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না? পার্থিব জগতের প্রেমিকরা নিজেদের প্রেমাস্পদের তুচ্ছ রাগ-অভিমানের বিষয়ে ভীত থাকে, প্রেয়সীকে অসন্তুষ্ট হওয়ার কোনও সুযোগ দেয় না, তবে এটা কিভাবে সম্ভব যে, একজন মোমেন, যে ঈমানের সুমিষ্ট স্বাদ আস্বাদন করেছে, সে আল্লাহ্ তা'লার বিরাগভাজন হওয়ার বিষয়ে মোটেই ভীত হবে না? হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, একবার হযরত উমর (রা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.)-এর মাঝে কোনও একটি বিষয়ে বাক-বিতন্ডা হয় এবং তা ক্রমশ তীব্র রূপ ধারণ করতে থাকে। হযরত উমর (রা.) উগ্র প্রকৃতির ছিলেন, তাই হযরত আবু বকর (রা.) সেখান থেকে প্রস্থান করা সমীচীন মনে করলেন,যাতে অহেতুক বিবাদ বৃদ্ধি না পায়। হযরত আবু বকর (রা.) যাওয়ার উপক্রম করতেই হযরত উমর (রা.) এগিয়ে এসে হযরত আবু বকরের কুর্তা ধরে ফেলে বলেন, আমার কথার জবাব দিয়ে যাও। হযরত আবু বকর সেটা ছাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় তাঁর কুর্তা ছিঁড়ে যায়। তিনি সেখান থেকে সোজা নিজের বাড়ি চলে আসেন। কিন্তু হযরত উমর (রা.)-এর মনে এই আশঙ্কা তৈরী হয় যে, তিনি হয়তো রসুল করীম (সা.)-এর কাছে তাঁর বিষয়ে অভিযোগ জানাতে গিয়েছেন। তাই তিনিও হযরত আবু বকরের পিছু নিলেন, যাতে তিনিও রসুল করীম (সা.)-এর সমীপে নিজের অজুহাত পেশ করতে পারেন। কিন্তু রাস্তাতেই হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উমরের দৃষ্টির বাইরে চলে যান। হযরত উমর (রা.) এটাই ধরে নেন যে, তিনি এখন হযরত রসুল করীম (সা.)-এর কাছে অভিযোগ জানাতে গিয়েছেন। তিনিও সোজা রসুল করীম (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন। সেখানে গিয়ে দেখলেন, হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন না। কিন্তু যেহেতু তাঁর মনে অনুশোচনা ভাবের উদয় হয়েছিল, তাই তিনি নিবেদন করলেন- হে আল্লাহর রসুল! আমার ভুল হয়েছে, আমি আবু বকরের সঙ্গে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করেছি, আবু বকরের কোন দোষ নেই। দোষ আমারই। হযরত উমর

মহানবী (সা.)-এর বাণী

যখন তোমাদের কাছে কোনও ধর্মপরায়ণ ও নীতিবান ব্যক্তি বিবাহ প্রস্তাব পাঠায়, তখন সেই প্রস্তাব গ্রহণ করে নিও; অন্যথায় পৃথিবীতে অশান্তি ও অরাজকতা তৈরী হবে। (তিরমিযি, কিতাবুন নিকাহ)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rasheed, Basantapur, 24 PGS (s)

যুগ খলীফার বাণী

"জাতি সত্তা অর্জনের জন্য ঐক্য ও আনুগত্য অত্যন্ত জরুরী।" (খুতবা জুমআ, প্রদত্ত- ৫ ডিসেম্বর, ২০১৪)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, Bankura (W.B)

(রা.) যখন রসুলুল্লাহ (সা.)–এর সমীপে উপস্থিত হলেন, তখন কেউ একজন আবু বকরকে গিয়ে বলল, হযরত উমর (রা.) রসুল করীম (সা.–এর কাছে আপনার নামে অভিযোগ জানাতে গিয়েছেন। হযরত আবু বকর চিন্তা করলেন, আমাকেও নিজেকে দোষমুক্ত করতে যাওয়া উচিত, যাতে একপেশে সিদ্ধান্ত না হয় আর আমিও নিজের দৃষ্টিভঙ্গি রাখতে পারি। হযরত আবু বকর (রা.) যখন রসুল করীম (সা.)–এর মজলিসে পৌঁছলেন, তখন হযরত উমর (রা.) বলছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! ভুল আমার হয়েছে, আমিই আবু বকরের সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়েছি এবং তাঁর কুর্তা আমার হাতে ছিঁড়ে গিয়েছে। যখন রসুলুল্লাহ্ (সা.) একথা শুনলেন, তখন তাঁর মুখমণ্ডলে অসন্তুষ্টির ভাব প্রকট হয়ে ওঠে। তিনি (সা.)বললেন, হে লোকসকল! তোমাদের কি হয়েছে? যখন সমগ্র জগত আমাকে অস্বীকার করছিল আর তোমরাও আমার বিরুদ্ধে ছিলে, সেই সময় আবু বকরই আমার উপর ঈমান এনেছিল এবং সর্বোতভাবে আমাকে সাহায্য করেছে। অতঃপর তিনি অত্যন্ত বিষন্ন মনে বললেন, তোমরা কি এখনও আমাকে এবং আবু বকরকে ছেড়ে দিবে না? তিনি (সা.) এই কথাগুলি বলছিলেন, ঠিক সেই সময় হযরত আবু বকর (রা.) মজলিসে প্রবেশ করলেন। এটাই হল প্রকৃত প্রেমের দষ্টান্ত। যখন তিনি দেখলেন, রসুল করীম (সা.)–এর মনে শঙ্কা তৈরী হচ্ছে, তখন তিনি অজুহাত না দেখিয়ে কিম্বা নিজেদের দোষ আড়াল না করে একজন প্রকৃত প্রেমী হিসেবে এমনটি বরদাস্ত করেন নি যে, তাঁর কারণে রসুল করীম (সা.)–এর মনে কোন কষ্ট হোক। তাই তিনি, আসা মাত্রই রসুল করীম (সা.)–এর সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্ রসুল! উমরের কোন দোষ ছিল না। দোষ ছিল আমার। দেখ, হযরত আবু বকর (রা.) কিরূপ সত্যিকার প্রেমিক ছিলেন, তিনি কোনও মতেই বরদাস্ত করতে পারতেন না যে, তাঁর কারণে তাঁর প্রেমাস্পদের মনে কোন কষ্ট হোক।

রসুল করীম (সা.) হযরত উমর (রা.)–এর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন দেখে হযরত আবু বকর (রা.) মোটেই আনন্দিত হলেন না। সচরাচর মানুষের মধ্যে এই অভ্যেস থাকে যে, যখন দেখে, তার প্রতিপক্ষ তিরস্কৃত হচ্ছে,তখন সে আনন্দিত হয়। কিন্তু সেই প্রকৃত প্রেমিক পছন্দ করলেন না যে, রসুল করীম (সা.)–এর মনে কষ্টে হোক, সে যে কারণেই হোক না কেন। তিনি বললেন, আমি সমস্ত অপরাধ মাথা পেতে নিচ্ছি, কিন্তু আমি আমার প্রেমাস্পদের মনে কষ্ট দিতে পারব না। তিনি অত্যন্ত বিনম্রভাবে বললেন, হে রসুলুল্লাহ্! উমরের কোনও দোষ নেই, দোষ আমার। যদি হযরত আবু বকর (রা.) রসুল করীম (সা.)–এর অন্তরের বেদনা দূর করার উদ্দেশ্যে নিপরাধী হয়েও অপরের দোষ মাথা নেন, যাতে আঁ হযরত (সা.)–এর মনে কষ্ট না হয়, তবে এটা কি করে সম্ভব যে, একজন মোমেন খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সেই করবে না যা তাকে খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের দিকে নিয়ে যায়। নিঃসন্দেহে রসুল করীম (সা.) আমাদের নিকট সকলের চাইতেপিয় এবং আমরা খোদা তা'লার পর অন্য কাউকে অতটা ভালবাসতে প্রস্তুত নই। কিন্তু তবু খোদা তা'লা এবং রসুল করীম (সা.) এই দুইয়ের মর্যাদা সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমরা জানি যে, আঁ হযরত (সা.)–এর সম্মান ও মর্যাদা অতীব উচ্চ, যা অন্য কোন মানুষের জন্য অর্জন করা সম্ভব নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বান্দা আর আল্লাহ্ তা'লা উপাস্য। তিনি সৃষ্টি আর খোদা তা'লা স্রষ্টা। তিনি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ও অনুকম্পার নীচে অবস্থান করেন আর আল্লাহ্ স্বয়ং কল্যাণময়। আঁ হযরত (সা.) নশ্বর দেহের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা অবিনশ্বর, আদি ও অনন্ত। আঁ হযরত (সা.) আল্লাহ্ তা'লার মুখাপেক্ষী ছিলেন, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ংসম্পূর্ণ, তিনি নিজের প্রয়োজন নিজেই পূর্ণ করেন। আঁ হযরত (সা.) দুর্বল ছিলেন আর আল্লাহ্ তা'লা সর্বশক্তিমান ও সকল শক্তির অধিপতি। তাই যখন হযরত আবু বকরের হৃদয় রসুল করীম (সা.)–এর দুঃখ দেখে ব্যকুল হয়ে ওঠে,তখন একজন মোমেন রসুল করীম (সা.)–এর এই হাদীস إِنَّ أَبْغَضَ الْحَلَالِ عِنْدَ اللهِ الطَّلَاقُ পাঠ করে বা শ্রবণ করে, কিভাবে সহজেই এর বিরুদ্ধাচরণ করার ধৃষ্টতা দেখাতে পারে। যখন শরীয়ত বলছে যে, তোমরা এই নিকৃষ্টতম হালাল বিষয়টি থেকে বিরত থাক, তখন প্রত্যেক মোমেনের কর্তব্য এমন কাজ থেকে দূরে সরে আসার চেষ্টা করা এবং স্বামী–স্ত্রীর সম্পর্কে মনোমালিন্যের সময় ভুলে না যাওয়া।

একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, বস্তুত তালাক ও খোলা–র অর্থ একই। যখন পুরুষ স্ত্রীকে ত্যাগ করে,তখন সেটাকে তালাক বলা হয়,আর যখন কোনও স্ত্রী তার স্বামীকে ত্যাগ করে তখন তাকে খোলা বলা হয়। আর যদি কোনও স্ত্রী তার স্বামীকে বলে তাকে স্বাধীন করে দিতে তবে সেটা হবে খোলা। আর খোলা–ও নিকৃষ্টতম হালাল। যতদূর মানবাধিকারের প্রশ্ন, তালাক ও খোলা , দুটিই মুসলমানদের মধ্য থেকে হারিয়ে গিয়েছিল আর মুসলমানরা কোনও পরিস্থিতিতে এর উপর্ আমল করতে প্রস্তুত হত না। যার কারণে মহিলরা ভীষণ জটিলতার সম্মুখীন হত। আহমদীয়াত উভয় অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং মহিলাদেরকে সেই সব যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়েছে, যা তাদেরকে এই অধিকার না থাকার কারণে পোহাতে হত। সেই সঙ্গে হাদীসের মর্মার্থকেও মানুষের সামনে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে এবং বলে দিয়েছে যে, দুটি পথই অবলম্বন করা আল্লাহ্ তা'লার নিকট 'নিকৃষ্টতম হালাল।' কিন্তু এই অধিকার যেহেতু নতুন নতুন লাভ হয়েছে, আর প্রতিটি নতুন অধিকারকে যথেচ্ছ প্রয়োগ করা আমাদের দেশের প্রথা, সেই কারণে আমাদের জামাত এই দুই পন্থা অবলম্বন করার বিষয়ে ত্বরাপ্রবণতার পরিচয় দিয়েছে আর জামাতের একটি অংশ তালাক ও খোলার প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। অথচ কুরআন করীমের আদেশ হল, যখন স্বামী–স্ত্রীর মাঝে কোন বিবাদ সৃষ্টি হয়,তখন তা দূর করার জন্য বিচারক নিযুক্ত করা উচিত, যে চেষ্টা করবে তাদের বিবাদের নিষ্পত্তি করার আর পূর্বের ন্যায় যেন তারা প্রেমময় জীবন অতিবাহিত করতে পারে। কিন্তু যদি এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, যেখানে মীমাংসার কোনও পথ বের হওয়ার সম্ভাবনা নেই, সেক্ষেত্রে খোলার জন্য বিচারকের হাতে মামলা তুলে দেওয়া উচিত আর তিনিই এর বিচার করবেন। এমনিতে তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে খোলা ও তালাক পর্যন্ত বিষয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত দুঃখজনক। আর এই পন্থা এতটাই অপছন্দনীয় ও ভয়াবহ যে, প্রত্যেক সৎ প্রকৃতির মানুষের এটা ঘৃণা করা উচিত। স্বামী–স্ত্রীর ঐক্য ও সম্পর্ক কোন সাধারণ বিষয় নয়। দাম্পত্য সম্পর্ক যার সঙ্গে কোনও সম্পর্কের তুলনা হয় না, এমনকি পিতা–পুত্রের সম্পর্কেরও নয়। পুরুষ তার দেহের সেই অংশও নিজের স্ত্রীর সামনে প্রকাশ করতে পারে,যা তার পিতা–মাতার সামনে প্রকাশ করতে পারে না। অনুরূপভাবে নারী দেহের যে সমস্ত অংশ দেখা তাদের মাতা–পিতা ও ভাইবোনদের জন্য বৈধ নয়, সেগুলি সে নিজের স্বামীর কাছে প্রকাশ করে। এই ধরণের সম্পর্কের পর একজন পুরুষ যদি নিজের প্রথম স্ত্রীকে তালাক দিতে চায় বা স্ত্রী খোলা নিতে চায়,তবে তারা উভয়ে দাম্পত্য সম্পর্কে তাৎপর্য বুঝে উঠতে সক্ষম হয়নি। তাদের মতে এটা একটা খেলা। যে স্বামী তার স্ত্রীকে তালাকের মাধ্যমে বা স্ত্রী খোলার মাধ্যমে একে অপরের থেকে মুক্তি পেতে চায় তারা ইসলামী শিক্ষাকে উপহাসের পাত্রে পরিণত করেছে। যে স্ত্রী খোলা নিতে চায়, সে খোলা এই কারণে নেয় যে, যাতে সে অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে বিবাহ করতে পারে। ভিন্নবাক্যে এর অর্থ হবে সে নিজেকে বাজারে বিক্রি করতে চায়, অথচ ইসলাম তাকে অনেক উচ্চ সম্মানের আসনে বসিয়েছে। আর যে পুরুষ তালাক দিয়ে স্ত্রীর সম্মানকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে চায়, সে নৈতিক ও চারিত্রিক দিক থেকে অমুসলিমদের চায়তেও নিকৃষ্ট। কেননা, সভ্য হোক কিম্বা বর্বর, প্রত্যেক সমাজ,ধর্ম ও শ্রেণীতে মহিলাদের সম্মান স্বীকৃত এবং তাদেরকে এক পবিত্র সত্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। তাই একজন পুরুষ যদি অকারণে তার স্ত্রীকে তালাক দেয়,তবে সেক্ষেত্রে তাকে নৈতিক মূল্যবোধের মাপকাঠিতে অমুসলিমদের চেয়েও অধম হিসেবে ধরা হবে। আর কোনও মহিলা যদি অকারণ খোলা নিতে চায়, তবে নিজের সম্মান বৃদ্ধি করবে না বরং, নিজেকে বাজারে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং সে নিজের পবিত্র মর্যাদাকে ভুলে গিয়েছে। তাই যে সমস্ত মানুষ এই সব বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করে না, তারা জাতির নৈতিক মূল্যবোধ ও সম্মানকে নিজ হাতে জলাঞ্জলি দিচ্ছে। জামাতের কর্তব্য তালাক ও খোলার দুষ্পরিণামকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসা এবং এই প্রথার বহুল প্রচলনকে প্রতিহত করার চেষ্টা করা। আমার কাছে অনেকের মামলা আসে, আমি আশ্চর্য হই এটা দেখে যে, কত তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়কে বিচ্ছেদের কারণ বানিয়ে নেয়। ..... এমন ছোট খাটো বিষয় নিয়ে সম্পর্ক খারাপ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আমার মতে, স্ত্রীর যদি কোনও দোষ–ত্রুটি থাকে তবে তার চারিত্রিক সংশোধন করা উচিত, কিন্তু তাকে ত্যাগ করার জন্য ব্যগ্র হওয়া উচিত নয়। প্রধান শিক্ষক ছাত্রদের পড়া করে আসতে বলেন। যে ছাত্র পড়া

মহানবী (সা.)-এর বাণী

সদকা কখনও কারো সম্পদ হ্রাস করে নি আর আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা দানের কারণে বান্দার সম্মান বৃদ্ধিই করে থাকেন।

(সহী মুসলিম, কিতাবুর বির ওয়াসসিলাহ ওয়াল আদাব)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and family, Barisha (Kolkata)

মুখস্ত করে আসে না,তাকে কি তিনি স্কুল থেকে বের করে দেন? অনুরূপভাবে মানুষের মধ্যে বহু ভুল-ত্রুটি থাকে, উদাসীনতা ও দুর্বলতা থাকে, কিন্তু মোমেনের কাজ হল সেগুলি দূর করার চেষ্টা করা আর যে জাতিকে আল্লাহ তা'লা পবিত্র হিসেবে তৈরী করেছেন,তাকে বাজারী পণ্যে পরিণত না করা।

অতএব, আমি জামাতকে উপদেশ করছি, এমন ঝগড়া-বিবাদের গুরুত্বসহকারে নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করা উচিত আর আমি কাজীদেরকেও নসীহত করছি যে, এমন বিষয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। আমি আশ্চর্য হচ্ছি যে, কাজিরাও এই সমস্যাগুলিকে কেবল হাসি-তামাশা হিসেবে ধরে নিয়েছে, তারা মীমাংসার পথ বের করার পরিবর্তে মামলাগুলিকে দীর্ঘায়িত করতে থাকেন। বেশি সময় অতিক্রান্ত হওয়ার ফলে মনের মধ্যেও বেশি করে সন্দেহ দানা বাঁধে। আমি কাজিদের নির্দেশ দিচ্ছি, এমন মামলার ক্ষেত্রে তারা যেন কোনও পক্ষের উকিলকে কাছেও ঘেষতে না দেন আর কাজি না হয়ে তারা যেন পিতার ভূমিকা পালন করতে আগ্রহী হন, পাত্রকে নিজের ছেলে এবং পাত্রীকে নিজের কন্যা মনে করেন। যেভাবে পিতা নিজের সন্তানকে বোঝায়, ঠিক সেইভাবে তাদের বোঝান আর শরীয়তের খুঁটিনাটি বিষয়গুলি তাদের কাছে তুলে ধরুন আর তালাক ও খোলার ক্ষতিকারক দিকগুলি সম্পর্কে তাদের সচেতন করে বলুন- এই কাজ সমাজে বহুল প্রচলিত হলে জাতির নৈতিক অধঃপতন হয়। যাদের সন্তান থাকে, তারা যখন বড় হবে, তখন তাদের উপর কি প্রভাব পড়বে। তারা দেখবে, তাদের মা-বাপ সামান্য বিষয় নিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়েছিল আর তারা নিজেদের পিতামাতা থেকে কোনও উন্নত দৃষ্টান্ত গ্রহণ করবে আর এমন সন্তানরা কিভাবে উন্নতি করবে? তাই এগুলি নৈতিকতার মধ্যে কোনও উন্নতি ঘটায় না,বরং চারিত্রিক অধঃপতন ঘটায়। জামাতের উচিত এর গুরুত্ব অনুধাবন করা, কেননা,আমার মতে এটা যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েরও উর্দ্ধে। কাজির কাছে যখনই কোনও মামলা আসে,তার হৃদয় প্রকম্পিত হওয়া উচিত, একথা চিন্তা করে যে, পাছে আমার কোনও সিদ্ধান্ত খোদা তা'লার বিরাগভাজন হয়। আর এমন মামলার সকল দিক গভীরভাবে পর্যালোচনা করার পর সিদ্ধান্ত প্রদান করা উচিত। আর যখন এমন কোন বিবাদ সামনে আসে, তখন চেষ্টা করা উচিত, পুরুষ কিম্বা মহিলা কারো মা-বাবা-ই যেন হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা না করে, বরং কাজির উপর পূর্ণ আস্থা রাখে। যদি তাদের মনে হয়, বিচারে কোনও ত্রুটি থেকে গেছে, তবে তারা আমাকে লিখতে পারে। আমরা তখন দেখব যে, বিচারে সত্যিই কোনও ত্রুটি আছে কি না। এভাবে কাজিরাও ক্রমশ বিচক্ষণতা অর্জন করে ফেলবেন।

বিয়ের পর মা-বাবার অধিকার শেষ হয়ে যায় না,বরং বিয়ের পরও সন্তানের উপর মা-বাবার অধিকার থাকে। যদি এমন একজন মহিলা থাকে, যার একমাত্র কন্যা সন্তান ছাড়া তাকে দেখাশোনা বা সেবা শুশ্রুষা করার কেউ নেই, সেক্ষেত্রে তার মেয়ের বিয়ের পর তার জামাতার কর্তব্য হবে তার স্ত্রীকে মায়ের সেবা করার সুযোগ দেওয়া এবং তাকে মায়ের কাছে থাকতে দেওয়া, কিম্বা সে যদি স্ত্রীকে নিজের কাছে রাখতে চায় তবে তার বৃদ্ধা মায়ের দায়ভারও গ্রহণ করা। কেননা, প্রকৃত সেই দায়িত্বভার ছিল তার স্ত্রীর, কিন্তু যখন সে নিজের স্ত্রীকে সঙ্গে রাখতে চায়, সেক্ষেত্রে, শাশুড়ির দায়িত্বও তার নেওয়া উচিত। অনুরূপভাবে যদি ছেলের মা-বাবা যদি বয়োবৃদ্ধ হয় আর তাদের দেখাশোনা ও সেবা-শুশ্রুষার প্রয়োজন হয় , তবে মেয়ের কর্তব্য হবে তাদের সেবা করা এবং তাদের প্রতি কোমল আচরণ করা। এই দায়িত্ব স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের উপর বর্তায়। অনেকে এক্ষেত্রে অর্থাভাবের অজুহাত পেশ করে।কিন্তু আমার মতে, এই অজুহাতের কোনও যৌক্তিকতা নেই। আমার অভিজ্ঞতা বলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, গরীবদের ঘরে বেশি সন্তান হয়। তারাও তো নিজেদের সংসার করছে। আমার কাছে গরীবদের পক্ষ থেকে গমের জন্য যে সকল আবেদন এসেছে, তাদের অধিকাংশের ছয়-সাতজন, আট বা নয়জন করে সন্তান ছিল। আমি আশ্চর্য হলাম দেখে যে, যারাই আবেদন করে, তাদেরই আট-নয়জন করে সন্তান রয়েছে। আমি মনে করলাম, এরা হয়তো বাড়িয়ে বলছে। কিন্তু তদন্ত করিয়ে জানতে পারলাম, তারা সঠিক কথাই লিখেছে। এরা আট-নয়জন সন্তান জন্ম দিয়ে তাদের প্রতিপালন করতে ভয় পায় না। আপনারা মা-বাবার সেবা করতে কেন ভয় পাচ্ছেন? দু-একজন মানুষের খরচ বহন করা, আমার মতে, কোনও কঠিন কাজ নয়; তবে শর্ত হল মানুষের যদি সদিচ্ছা থাকে। যদি তোমরা স্ত্রীর মা-বাবার সেবাযত্ন কর, তাদের প্রতি সদয় আচরণ কর, তবে তোমার স্ত্রী তোমার প্রতি আন্তরিকভাবে বিশ্বস্ত হবে, তোমাকে অনেক বেশি ভালবাসবে আর পূর্বের চায়তে তোমার অনুগত হবে। কিন্তু একথা সব সময় মনে রাখবে যে, যদি তার মা-বাবাকে নিজের সঙ্গে রাখলে তাদেরকে ভৃত্য মনে করে রাখবে না। বরং তাদেরকে নিজের সর্দার মনে করে রাখবে। তাদের প্রতি ভৃত্যসুলভ আচরণ করবে না। আমি দেখেছি, অনেকে নিজের কিম্বা নিজের স্ত্রীর মা-বাবাকে নিজেদের সঙ্গে রাখে, কিন্তু তাদের প্রতি প্রত্যাশা থাকে যে, তারা কাজকর্মও করবে। এই পন্থা পছন্দনীয় নয়।

প্রায় দেখা গেছে যে, মেয়ের মা-বাবা মেয়েকে এই শিক্ষা দিয়ে থাকে যে, স্বামীর মা-বাবাকে তার কাছে আসতে দিবে না। পক্ষান্তরে ছেলের মা-বাবা ছেলেকে এই শিক্ষা দেয় যে, দেখো, মেয়ের মা-বাবাকে কাছে ঘেষতে দিবে না। তাদের নির্দেশ মত ছেলে ও মেয়ে উভয়ে কাজ করতে শুরু করে। এর পরিণামে তাদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ শুরু হয়। ছেলে বলে, সে আমার মা-বাবাকে খারাপ মনে করে আর মেয়ে বলে, সে আমার মা-বাবাকে সম্মান করে না। যে সমস্ত মা-বাবা নিজেদের ছেলে বা মেয়েকে এই শিক্ষা দেয়, তারা নিজেদের সন্তানের হিতাকাঙ্খী নয়। বরং তারা নিজেদের সন্তানের নিকৃষ্ট শত্রু। আর আমার মতে তারা শয়তানের সমতুল্য। কেননা ভেদাভেদ ও অনৈক্য পছন্দ করা শয়তানের কাজ। এমন মানুষদের মনে রাখা উচিত যে, তারাও অন্য কোনও ছেলে বা মেয়ের কাছ থেকে কোনও সম্মান পায় না। মা-বাবা-ই যেখানে জঘন্য উপদেশ দেয়, সেখানে সম্মর্ক কিভাবে উন্নত হতে পারে? আর ছেলেমেয়েদের জীবন ধ্বংস করার পিছনে সব থেকে বড় হাত তাদের মা-বাবার। কেননা, মাবাবা-ই এমন শিক্ষা দিয়ে থাকে যে, স্বামীর বা স্ত্রীর মা-বাবাদের কাছে আসতে দেওয়া উচিত নয়। এই কারণে বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একবার মনোমালিন্য অবশ্যই তৈরী হয় আর অনেক সময় এই মনোমালিন্য খুলা কিম্বা তালাক পর্যন্ত পোঁছে যায়। যদি তাদের মধ্যে এক পক্ষ দমে যায় আর অপর পক্ষ নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে ফেলে, তবে কর্তৃত্ব স্থাপনকারী পক্ষের মাতা-পিতাকে জবাব দিয়ে দেয়। যাইহোক এটা লাঞ্ছনাজনক বিষয় আর আমার মতে এই পন্থা অত্যন্ত নিষ্ঠুর। ধরে নাও, স্ত্রী তার স্বামীর উপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে ফেলল আর সে মা-বাবার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিল আর তাদের সেবা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, তখন সেই ছেলের উপর খোদার অভিসম্পাত নেমে আসবে। কিন্তু সেই সাথে মেয়ের উপরও খোদার অভিসম্পাত হবে। কেননা সে তাকে মাতা-পিতার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য করেছে। আর যদি মেয়ে যদি নিজের মাতা-পিতাকে ত্যাগ করে তবে, মেয়ের উপর অভিসম্পাত হবে আর সেই সঙ্গে ছেলের উপরও অভিসম্পাত হবে। কেননা সে তাকে সরাসরি বাধ্য করেছে।অতএব,যদি ছেলের কারণে মেয়ে তার মাতা-পিতাকে ত্যাগ করে,মেয়েও অভিশপ্ত হবে আর ছেলেও অভিশপ্ত হবে। আর যদি মেয়ের কারণে ছেলে তার মা-বাবাকে ত্যাগ করে, তবে ছেলেও অভিশপ্ত হবে আর মেয়েরও অভিশপ্ত হবে। এই বিষয়টি চতুর্দিক থেকে আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টি ঘিরে রাখে। এর থেকে বেঁচে চলা মোমেনের কর্তব্য।

আমাদের উলেমাদের উচিত এই বিষয়গুলিকে দিনরাত মানুষের সামনে উপস্থাপন করা এবং ইসলামী শিক্ষাকে বার বার মানুষের সামনে পেশ করা যাতে মানুষের মাথায় গেঁথে যায় যে,তালাক ও খোলা অত্যন্ত অপছন্দনীয় বিষয় আর এগুলি তখনই প্রয়োগ করা উচিত যখন উপায়ন্তর থাকে না। আর কাজিদেরও উচিত পিতার ভূমিকা নিয়ে উভয়ের মধ্যে মীমাংসার পথ বের করার চেষ্টা করা আর কোনও পক্ষের উকিলের হস্তক্ষেপ করার অনুমতি না দেওয়া এবং সহানভূতি, ভালাসা এবং বিনম্রতাসহকারে বিবাদের নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করা। অনেক সময় পরিস্থিতি অনেক খারাপ হয়ে যায়, বাহ্যতঃ কোনও উপায় চোখে পড়ে না। কিন্তু যদি আন্তরিকতার সাথে এই বিবাদের নিষ্পত্তি করার সংকল্প করা হয়,তবে আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপাগুণে পরিস্থিতিকে অনুকুল করে দেন। একবার আমার কাছে এই ধরণের একটা বিবাদ উপস্থিত হয়। স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের মনে একে অপরের প্রতি চরম বিদ্বেষ জন্ম নিয়েছিল। আমি তাদের দুজনকে ডেকে স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে বোঝালাম। কিন্তু ছেলেটি বলল, আমি কখনই তাকে স্ত্রী হিসেবে রেখে দিতে প্রস্তুত নই। সে আমার ভাইকে

এরপর ১৫ পাতায়...

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

তুমি বল, 'হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ্! তুমি যাহাকে চাহ রাজত্ব দান কর এবং যাহার নিকট হইতে চাহ রাজত্ব কাড়িয়া লও।

(আলে ইমরান:২৭)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa Sb., Berhampur, Murshidabad

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর মহান কীর্তি
জামাতী সংগঠন এবং অঙ্গ-সংগঠনসমূহের প্রতিষ্ঠা ও এর কল্যাণ

এই বক্তব্যটি 'সোয়ানেহ ফজলে উমর' থেকে নেওয়া হয়েছে, যার পাঁচটি খণ্ড আমাদের ওয়েবসাইট আল ইসলামে রয়েছে। প্রথম দুটি খণ্ডের রচয়িতা হলেন হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.), যিনি পরবর্তীতে খিলাফতের মসনদে আসীন হয়েছেন। এই জন্য এই বক্তব্যে বর্ণিত চিন্তাধারা এবং ভাষা সেই মহান সত্তার, যিনি হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) খুব কাছে থেকে দেখেছেন এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর কাজকর্মের এমন অসাধারণ চিত্রায়ন করেছেন যার থেকে উত্তম সম্ভব নয়।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) ৫২ বছর পর্যন্ত খিলাফতের মসনদে আসীন থাকেন। এই দীর্ঘ খিলাফতকালে তিনি ইসলাম আহমদীয়াতের এমন অসাধারণ সেবা করেছেন এবং এমন কীর্তি রেখে গেছেন যা থেকে একজন নবীর গুণাবলী পরিলক্ষিত হয়েছে। যদিও মহা সম্মানিত আল্লাহ্ তাঁকে নবী নামে অভিহিত করেন নি, কিন্তু তিনি তাঁর দ্বারা নবীর কাজই করিয়েছেন। সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন-

"আমি খলীফা নই, বরং প্রতিশ্রুত খলীফা। আমি প্রত্যাদিষ্ট নই, কিন্তু আমার কথায় খোদা তা'লার কথা আছে, খোদা তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে সংবাদ দিয়েছিলেন। অর্থাৎ এই খিলাফতের মর্যাদা হল মামুরিয়াত ও খিলাফতের মধ্যবর্তী পর্যায়ের আর এমন নয় যে, আহমদীয়া জামাত এটিকে বিফলে যেতে দিবে এবং খোদা তা'লার নিকট নতজানু হবে। যেভাবে একথা সঠিক যে, নবী প্রতিদিন আসে না, অনুরূপভাবে এটাও সঠিক যে, প্রতিশ্রুত খলীফাও প্রতিদিন আসে না। "

(সোয়ানেহ ফজলে উমর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫০৮)

আল্লাহ্ তা'লা তাঁর আগমণকে নিজের আগমণ হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন-

كَاَنَّ اللّٰهَ نَـــزَلَ مِنَ السَّمَاءِ

অর্থাৎ তাঁর আগমণ যেন আকাশ থেকে খোদার অবতরণ। এটি তাঁর আযিমুশশান সাহায্য ও সমর্থনের প্রতি ইঙ্গিত ছিল। সম্মানীয় শ্রোতাবর্গ! এখানে একটু দাঁড়িয়ে চিন্তা করার বিষয় যে, যে ব্যক্তির আগমণকে আল্লাহ্ তা'লা নিজের আগমণ হিসেবে আখ্যায়িত করছেন, সে কিরূপ মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ হবেন। অতএব, নিঃসন্দেহে তাঁর সত্তা কোনও সাধারণ সত্তা ছিল না, বরং সেই বিশেষ আদম সন্তান ছিলেন, যিনি বহু শতাব্দীতে,বরং হাজার হাজার বছরে একবার মানবতার দিগন্তে উদিত হন আর যাঁর জ্যোতি বহু মানব প্রজন্মকে আলোকিত করতে থাকে।"

শ্রোতাবর্গ! খিলাফতের মসনদে আসীন হতেই সর্বপ্রথম তিনি খিলাফতের অস্বীকারকারীদের ফিতনার সম্মুখীন হন। জামাতের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি তখনও খিলাফতকে প্রত্যাখ্যানকারীদের দখলে। প্রেসের অধিকাংশই তাদের হাতে ছিল। সিন্দুকের চাবিও তাদের হাতেই ছিল। আর এমন পরিচিত মুখ ও বাহ্যত মহান ব্যক্তিত্ব ছিল, যারা তাদের সমচিন্তক ছিল আর জামাতের উপর তাদের ব্যপক প্রভাব ছিল। তারা জামাতের তবলীগ ও প্রসারের সমস্ত মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে সমগ্র ভারতে খিলাফত ব্যবস্থাপনাকে প্রত্যাখ্যানে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ভয়াবহ ও বিষাক্ত প্রোপোগান্ডা অভিযান পরিচালনা করতে শুরু করে দেয়।

শ্রোতামণ্ডলী! যদিও পরেও অনেক বিপদ ও সংকট এসেছে। কিন্তু সংকল্প ও অবিচলতার পরীক্ষা নিঃসন্দেহে একটি বিশেষ পরীক্ষা ছিল। আল্লাহ তা'লা তাঁকে প্রত্যেক সংকটের মুহূর্তে নিজ কৃপা ও অনুগ্রহে সাহায্য করেছেন এবং একের পর এক ভয়াবহ স্থান থেকে জামাতকে অত্যন্ত সফলতার সাথে উদ্ধার করে বিজয় ও সাহায্যের নতুন গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হতে থেকেছেন।

শ্রোতাবর্গ! হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর সর্বপ্রথম এবং সবাধিক গুরুত্বপূর্ণ সাংগাঠনিক কাজ হল ছত্রভঙ্গ হতে চলা জামাতকে দ্রুত এক হাতে একত্রিত করা এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাওয়া পৃষ্ঠাগুলি একত্রিত করে একটি দৃঢ় গ্রন্থের রূপ দেওয়া। এবং وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ এর প্রতিশ্রুতি আরও একবার পূর্ণ করা। এবং এর মাধ্যমে আরও একবার এই সত্য প্রকাশ্যে আসে যে, ইসলামের জীবন, এর স্থায়ীত্ব এবং শান্তি সর্বদা খিলাফত ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে।

প্রতিশ্রুত সংস্কারক হিসেবে তাঁর যাবতীয় কার্যকলাপের উপর দৃষ্টি দিলে আমরা দেখতে পাই তাঁর এই কর্মকাণ্ড নিঃসন্দেহে অভূতপূর্ব, যার জৌলুস প্রত্যেককে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে। কেননা, তিনি আহমদীদের হৃদয়ে খিলাফতের মহত্ব ও গুরুত্বকে চিরতরে স্পষ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। মতানৈক্যের দর্শন ও উস্কানিমূলক বিষয়গুলিকে জামাতের সামনে এমন সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, খিলাফত ব্যবস্থাপনা কে সুদৃঢ় করতে যখন এবং যে অবস্থাতেই কোনও আহ্বান জানানো হয়েছে, জামাত অবিলম্বে সেই আহ্বানে সাড়া দিয়েছে এবং সেই সব বিচ্ছিন্নতাবাদের দর্শনকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে।

আহমদীয়া জামাতের ইমাম হিসেবে খিলাফতের প্রারম্ভিক সময় থেকেই জামাতের ব্যবস্থাপনাকে সুদৃঢ় করার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছিল। তাঁর আশঙ্কা ছিল, যেভাবে ইসলামে খিলাফতে রাশেদা যে সকল বিপদাবলীর সম্মুখীন হয়েছিল, যদি পুনরায় একই ধরণের বিপদাপদের সম্মুখীন আহমদীয়া খিলাফতকে হতে হয়, তবে জামাত যেন সফলভাবে তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে। তাছাড়াও বিভিন্ন জাতির উত্থান ও পতনের কারণসমূহ বিশ্লেষণ করে তিনি এমন সব পন্থা অবলম্বন করতে চাইতেন যা জামাতের উন্নতির পথ মসৃণ করার আর চিরস্থায়ী সত্যিকার এবং সক্রিয় জীবনের নিশ্চয়তা দিতে পারে। জামাতের ব্যবস্থাপনা গঠনের বিষয়ে তিনি যে সকল পন্থা অবলম্বন করেন এবং যে সব পরিকল্পনা ভেবে রাখেন তা এমন এক ব্যক্তির দ্বারাই সম্ভব ছিল যিনি একাধারে ঐতিহাসিক ও চিন্তাবিদ হবে। বিদ্বান হওয়ার পাশাপাশি যাঁর জ্ঞান কর্মের মাধ্যমেও প্রতিফলিত হয়। যিনি মানব-স্বভাব সম্পর্কে সম্যক অবগত আর বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের প্রকৃতির উপর গভীর দৃষ্টি রাখেন। এবং সর্বোপরি আধ্যাত্মিকতার বিষয়ে যাঁর অভিজ্ঞতা আছে। এই সকল গুণাবলী তাঁর সত্তায় কেন্দ্রীভূত ছিল আর এগুলির সমন্বয়ে সেই ব্যবস্থাপনা জন্ম নিয়েছিল যা আজ আহমদীয়া জামাতের ব্যবস্থাপনা রূপে জগতের সামনে এক আদর্শ ব্যবস্থাপনা হিসেবে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

স্মরণ রাখা উচিত যে, যুগ-খলীফা-ই হলেন সমগ্র ব্যবস্থাপনার সর্বময় কর্তা। আর বিশ্বজনীন জামাতের শাখা-প্রশাখাগুলি গ্রাম-গঞ্জ থেকে বেরিয়ে জেলা, রাজ্য এবং সমগ্র দেশে ছড়িয়ে আছে, যেগুলি তসবীহ-র হারের মুক্তোর ন্যায় একটা পোক্ত সুতোয় বাঁধা আছে। যেখানেই তিন বা ততধিক আহমদী থাকবে, সেখানে যথারীতি জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়। আর পরিস্থিতি অনুযায়ী মনোনয়ন বা নির্বাচনের মাধ্যমে একজন সদর নির্বাচন করে দেওয়া হয়। বড় জামাতগুলিতে আমারত ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দিক থেকে প্রত্যেক স্থানীয় জামাতের সদর বা আমীর সেখানকার সর্বোচ্চ কর্মকর্তা হয়ে থাকেন। এরপর জেলা বা রাজ্য স্তরের জামাতের জন্য একজন আমীন নিযুক্ত করা হয়। এর উর্দ্ধে সমগ্র দেশের একজন জাতীয় আমীর থাকেন। এছাড়া জামাতীয় ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন বিভাগ প্রতিষ্ঠিত আছে আর তাদের তত্ত্বাবধায়ককে সেক্রেটারী বলা হয়। যেমন সেক্রেটারী মাল, সেক্রেটারী তালিম,সেক্রেটারী জায়েদাদ, সেক্রেটারী জিয়াফত ইত্যাদি। এই সকল কর্মকর্তা নির্বাচনের মাধ্যমে, কিম্বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে মনোনয়নের মাধ্যমে নিযুক্ত হন, যারা কেবল স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের প্রেরণা নিয়ে জামাতের সেবা করার মধ্যে আনন্দ খুঁজে পান। জেলা, রাজ্য ও জাতীয় স্তরের এই সকল কর্মকর্তারা ছাড়াও যুগ-খলীফার তত্ত্বাবধানে নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান কাজ করে থাকে।

সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া:

এটা জামাতের সব থেকে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান যা জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর জীবদ্দশাতেই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। প্রাথমিক পর্যায়ে এর রূপ এমন ছিল না, বরং বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হওয়ার পর হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) -এর যুগে ক্রমশ এটি বর্তমান আকার ধারণ করে। জামাতের আবশ্যিক চাঁদার ব্যবস্থাপনা এবং সমস্ত তরবীয়তী, তালিমী, তবলীগি এবং সেবামূলক কার্যক্রমের তদারকির দায়িত্ব এই

যুগ ইমামের বাণী

খোদা তোমাদের সঙ্গে থাকবেন, যদি তোমরা মুত্তাকি হও এবং তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথসমূহে বিচরণ কর।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২০০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk.Fayjal Sb. and Family, Jaynagar, Bankura, WB

আঞ্জুমানের উপরই ন্যস্তা। সমস্ত জেলা ও রাজ্য স্তরীয় আমারত ব্যবস্থাপনা এই আঞ্জুমানের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। এই আঞ্জুমানের অধীনে একাধিক দপ্তর এবং নাযারত রয়েছে। প্রতিটি নাযারাতের সর্বময় কর্তাকে 'নাযের' বলা হয়। যেমন, নাযির তালিম, নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ, নাযির নশর ইশাআত, নাযির বায়তুল মাল আমদ ও খরচ, নাযির আমুরে আমা প্রভৃতি। আর সমগ্র আঞ্জুমানের তত্ত্বধায়ককে 'নাযির আলা' বলা হয়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আস সানী (রা.) দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনার কাজগুলির বিষয়ে নাযিরদের ডেকে সরাসরি নির্দেশ দিতেন এবং তিনি নিজে তাদের কাজের তদারকি করতেন। কিন্তু এছাড়াও জামাতের তরবীয়তের জন্য অনেক সময় গণ-ভাষণেও নাযিরদের এমনভাবে পথপ্রদর্শন করতেন যে জামাতের সাধারণ সদস্যরাও জামাতের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অবহিত হয় আর ভবিষ্যতে জামাতের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মীর সরবরাহ বজায় রাখতে সহায়ক হয়।

ব্যবস্থাপনার সর্বময় কর্তা হিসেবে তিনি একদিকে নীতিগত নির্দেশনা প্রদান করেন এবং অনেক সময় বিস্তারিত দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। অপরদিকে তিনি মাঝে মধ্যে কাজে পর্যালোচনাও করতে থাকেন আর কখনও কঠোর আবার কখনও কোমলতা আবার কখনও ক্ষমাসুন্দর আচরণের সাথে ব্যবস্থাপক ও কর্মীদের সংশোধন করে থাকেন। তাঁর ক্ষমা করার পদ্ধতি অত্যন্ত সুন্দর, অনেক ভুলত্রুটি তিনি এড়িয়ে যান আর শাস্তি প্রদানের সময় অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে প্রবন্ধনের দুর্বলতা খতিয়ে দেখেন। যদিও সাধারণ কর্মীদের জন্য প্রাত্যাহিক অফিসের সময় নির্ধারিত ছিল, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ জামাতী প্রয়োজনের সময় তিনি অফিসের সময়কেও উপেক্ষা করতেন আর প্রত্যেক কর্মীদের কাছে প্রত্যাশা রাখতেন যদি চব্বিশ ঘন্টা উপস্থিত থাকতে বলা হয় তবে তারা চব্বিশ ঘন্টা-ই উপস্থিত থাকার জন্য প্রস্তুত থাকবে। ব্যক্তিগতভাবে তিনি নিজেও অফিসের সময়ের ব্যাপারে দিন রাতের পরোয়া করতেন না, দিনের অধিকাংশ সময়ই জামাতের কাজে নিজেকে উৎসর্গিত রাখতেন। প্রত্যহ প্রায় ষোলো ঘন্টা কাজ করা তাঁর নিয়ম ছিল। অধীনস্ত কর্মীদেরও কাছ থেকেও তিনি এমন পরিশ্রমের প্রত্যাশা করতেন। যেমন-যখনই জামাতের স্বার্থের জন্য প্রয়োজন হত, সময় অসময় না দেখে সংশ্লিষ্ট অফিসারকে ডেকে পাঠাতেন আর কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য প্রয়োজন মনে করলে পুরো অফিসকেই খোলা রাখার নির্দেশ দিতেন। এমতাবস্থায় অনেক সময় অফিস চব্বিশ ঘন্টা খোলা থাকত আর কখনও এই ধারা পরিস্থিতি অনুসারে কয়েক দিন, সপ্তাহ কিম্বা মাস পর্যন্ত অব্যাহত থাকত। কর্মীদের পালাক্রমে ডিউটিতে নিযুক্ত করা হত। কিন্তু সাধারণত প্রত্যাশা করা হত যে নাযিরগণ সব সময় উপস্থিত থাকবেন। এই কারণেই অনেক সময় নাযিরগণ নিজেদের বিছানাপত্র নিয়ে অফিসেই থাকার ব্যবস্থা করে ফেলতেন আর পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত বাড়ির খোঁজ পর্যন্ত নিতেন না।

তাহরীকে জাদীদ আঞ্জুমান আহমদীয়া:

বিদেশে তবলীগ ও ইসলাম প্রসারের উদ্দেশ্যে ১৯৩৪ সালে হযরত মুসলেহ মওউদ (আ.) 'তাহরীকে জাদীদ' নামে একটি নতুন আর্থিক প্রকল্পের প্রবর্তন করেন। এই প্রকল্পের চাঁদা থেকে একত্রিত অর্থ এবং ওয়াকফীনে জিন্দগীদের প্রবন্ধন এবং বিদেশে তবলীগের কার্যক্রম তদারকির জন্য 'আঞ্জুমান তাহরীকে জাদীদ'-এর প্রতিষ্ঠা হয়। এই প্রতিষ্ঠানের অধীনেও বিভিন্ন বিভাগ প্রতিষ্ঠিত আছে,আর প্রত্যেক বিভাগের ইনচার্জকে 'ওয়াকিল' বলা হয়। যেমন 'ওয়াকিলুত তালীম', 'ওয়াকিলুত তবশীর', 'ওয়াকীলুল মাল' ইত্যাদি। এই আঞ্জুমানের নিগরানকে 'ওয়াকিলুল আলা' বলা হয়।

শ্রোতাবর্গ! তাহরীকে জাদীদের বিষয়টি উল্লেখ করার পাশাপাশি মজলিসে আহরার-এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়াও সমীচীন হবে।

আহরাররা ১৯৩৪ সালে জামাতের তুমুল বিরোধিতা করে আর সমগ্র ভারতে মুসলমানদের উস্কানি দেয় এবং জামাতের বিরুদ্ধে এমন প্ররোচনামূলক কার্যক্রমকে নেতৃত্ব দেয় যা থেকে একমাত্র আল্লাহ্ই রক্ষা করতে পারেন। মজলিসে আহরার ঘোষণা করল-

* আমরা এক বছরের জন্য সংকল্প করেছি, হাঁড়ি-মুচি,হিন্দু, শিখ কিম্বা খৃষ্টান-কাউকেই তবলীগ করব না, তাদের কাছে আমরা যাবও না। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য মির্যাইয়াতকে (আহমদীয়াত) নির্মূল করা।

জামাতের বিরুদ্ধে তারা ভিত্তিহীন অপবাদ আরোপ করল, যাতে মুসলমানদের ভুল বোঝানো যায় যে, জামাত আহমদীয়া ইসলাম ও এদেশের হিতাকাঙ্খী নয়। সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) অত্যন্ত ধৈর্য,অবিচলতা ও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সমস্ত অপবাদের জবাব দিলেন এবং তাদেরকে মোবাহালার জন্য আহ্বান করলেন, যাতে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীদের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল।

মোবাহালা থেকে আহরারদের পলায়ন এমন স্পষ্ট বিষয় ছিল যে, এটি তাদের সব থেকে বড় দুর্বলতা হয়ে দেখা দেয় আর জনৈক সাংবাদিক তাদের এই দুর্বল স্থানেই আঘাত করে বসেন। তিনি লেখেন-

"আমি মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ নই, যার সঙ্গে মোবাহালার কথা শুনে আহরার নেতাদের গাত্রদাহ শুরু হয়ে যায়।"

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) জামাতকে আশ্বস্ত করে বলেন-

"তোমরা আহরারীদের নৈরাজ্যকে ভয় পেয়ো না। আমি দেখতে পাচ্ছি তাদের পরাজয় আসন্ন।"

একদিকে মজলিসে আহরার জামাতকে মুছে ফেলার দাবি করছিল, অপরদিকে ইসলামের বীরপুরুষ ইসলামকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিতে নিজের সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছিলেন। তাহরীকে জাদীদের সফলতার কথা উল্লেখ করে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন-

"এর মাঝে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তাহরীকে জাদীদের অধীনে জাপান, চীন, সুমাত্রা এবং জাভাতে আমাদের মুবাল্লিগ গিয়েছেন। এই প্রকল্পের অধীনে স্পেন,ইতালি, হাঙ্গেরী, পোল্যান্ড, আলবেনিয়া, যুগোস্লাভিয়া, আমেরিকা এবং আফ্রিকার কয়েকটি উপকূলেও মুবাল্লিগ গিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এই সকল মুবাল্লিগদের মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষ আহমদীয়াতে প্রবেশ করেছে।"

(আল ফজল, ২৮ শে নভেম্বর, ১৯৪৪)

আর আজ আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় দু'শর বেশি দেশে আহমদীয়াতের বৃক্ষ রোপিত হয়েছে।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আহরারীরা যারপরনায় লাঞ্ছিত হয়েছে। নির্বিবাপূর্ণভাবে সকলেই তাদেরকে ইসলামের বিশ্বাসঘাতক বলে আখ্যায়িত করেছে। তাদেরই আপনজনেরা তাদের সম্পর্কে ছন্দ লিখেছে-

'যারা আল্লাহ্র আইন সনাক্ত করার বিষয়ে উদাসীন/ ইসলাম, ঈমান ও অনুগ্রহ থেকে উদাসীন/ কাফেরদের সঙ্গে মিত্রতা আর মুসলমানদের বিষয়ে উদাসীন/ আর দাবি করে, 'ইসলামের সেনা'/ সেনা কোথায়? এরা তো ইসলামের গাদ্দার/ পাঞ্জাবের আহরার ইসলামের গাদ্দার।

আঞ্জুমান আহমদীয়া ওয়াকফে জাদীদ:

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) -এর একটি মহান কীর্তি হল ওয়াকফে জাদীদের প্রবর্তন। প্রাথমিকভাবে এটি কেবল উপমহাদেশের জন্য ছিল। পরবর্তীতে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) সমগ্র বিশ্বের জন্য এই প্রকল্পটিকে বিস্তৃত করেন। ওয়াকফে জাদীদ প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য হল গ্রামীণ জামাতগুলির তরবীয়ত ও সংশোধন করা, যাতে তাদের অভিমুখ অবনতির দিক থেকে নতুনভাবে উন্নতির দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়। এর অত্যন্ত সুমিষ্ট ফল প্রকাশ পেয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায়, মুয়াল্লিমীন ও মুবাল্লিগীনদের মাধ্যমে ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষা ও কুরআন শেখা ও শেখানোর এমন কাজ শুরু করা হয়েছে যা সমগ্র জামাতকে অত্যন্ত সুদৃঢ়, বলিষ্ঠ, সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ করেছে। এই তাহরীকের মাধ্যমে একত্রিত চাঁদার প্রবন্ধন এবং তালীম ও তরবীয়তের জন্য নিযুক্ত মুয়াল্লিমদের তদারকি করার জন্য 'ওয়াকফে জাদীদ আঞ্জুমন আহমদীয়া' নামে পৃথক একটি আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই আঞ্জুমানের অধীনে বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে আর প্রতিটি বিভাগের ইনচার্জকে নাযিম বলা হয়।

আমারত ব্যবস্থাপনা:

সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার ব্যবস্থাপনা পরিপূর্ণ হওয়ার পাশাপাশি হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) সর্বত্র যথারীতি আমারত ব্যবস্থাপনার প্রচলন করেন এবং অনেক চেষ্টা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে জামাতের ব্যবস্থাপনার মাঝে আমীরের আনুগত্যের চেতনা তৈরী করেন। ইসলাম আমারতের যে অবধারণা প্রতিষ্ঠিত করেছে হুযুর সে সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল ছিলেন আর এর প্রতিটি আঙ্গিকের উপর গভীর দৃষ্টি ছিল। তিনি এবিষয়ে জামাতকে অত্যন্ত মূল্যবান উপদেশ দান করেছেন এবং আমারত পদের

যুগ ইমামের বাণী

অতএব, কুরআন শরীফ অনুধাবন করা এবং সেই অনুযায়ী হিদায়াত লাভের জন্য তাকওয়া প্রধান ও আবশ্যক বিষয়।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১২১)

দোয়াপ্রার্থী: Late-Rafiquddin Ahmad & Afifa Begum, From Lutful Haque Sb., Kandi (MSD)

গুরুত্বকে জামাতের সদস্যদের মনে ভালভাবে গেঁথে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

মজলিসে শূরা বা পরামর্শ বৈঠক

১৯২২ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ আস সানি (রা.) প্রথমবার যথারীতি মজলিসে শূরার ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করেন। ১৯২২ সালের মজলিসে শূরা জামাতের ইতিহাসে এক বিশেষ গুরুত্ব রাখে, বিশেষ করে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর উদ্বোধনী ভাষণ, যাতে তিনি মসজলিসে শূরার উদ্দেশ্যাবলীর উপর আলোকপাত করার পর ইসলামে পরামর্শ দানের পদ্ধতি, পরামর্শসভার রীতি, মতামত দাতাদের কর্তব্য, আলোচ্য বিষয়ের চিন্তাভাবনা করার পদ্ধতি এবং সভার সিদ্ধান্ত ও মূল্যের কথা তুলে ধরেন।। তাঁর এই উদ্বোধনী ভাষণ জামাতে আহমদীয়ার শূরা ব্যবস্থাপনার জন্য নিঃসন্দেহে এক অধ্যাদেশের মর্যাদা রাখে। ১৯২২ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠান সরাসরি হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.)-এর তদারকি ও তত্ত্বধানে বিকশিত হতে থাকে। আমরা এই ব্যবস্থাপনার যে বর্তমান রূপ দেখতে পাই, তার ছত্রে ছত্রে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.)-এর ভূমিকা ও ব্যক্তিত্বের ছাপ রয়েছে। আর এটি প্রতিষ্ঠার পিছনে তাঁর বছরের পর বছরের কঠোর পরিশ্রম, তীক্ষ্ণ তদারকি এবং নিষ্ঠাপূর্ণ দোয়ার অনেক বড় অবদান আছে।

শ্রোতাবর্গ! অঙ্গসংগঠনগুলির প্রতিষ্ঠা হুযুরের অসাধারণ সাংগাঠনিক দক্ষতার প্রমাণ। সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) সমগ্র জামাতকে এক সূত্রে গেঁথে রেখে পরস্পরকে কর্মের বাঁধনে বেঁধে রাখতে অঙ্গসংগঠনগুলি গঠন করেন। ১৯২৩ সালে লাজনা ইমাউল্লাহ্, ১৯৩৫ সালে খুদ্দামুল আহমদীয়া এবং ১৯৪০সালে মজলিস আনসারুল্লাহ্ সংগঠন প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

সর্বপ্রথম লাজনা ইমাউল্লাহর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। আহমদী মহিলারা তাঁর নেতৃত্বে একের পর এক উন্নতির যে সমস্ত ধাপ অতিক্রম করেছে তার বিবরণ অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক আর ইসলাম দরদীদের জন্য ঈমান উদ্দীপক। মহিলাদের জন্য বিশেষ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়, যেখানে ধর্মীয় শিক্ষার দিকটিও অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল। এরপর লাজনা ইমাউল্লাহ্ সংগঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন কারিগরী শিক্ষার প্রশিক্ষন, মহিলাদের পৃথক খেলাধূলার ব্যবস্থা, তাদের মধ্যে বিতর্ক সভা ও বক্তব্যদানের উৎসাহ তৈরী করা, নিবন্ধ রচনার প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, তাদের জন্য পৃথক পত্রিকা প্রবর্তন করা এবং জলসা সালানায় মহিলাদের জন্য পৃথক অধিবেশনের ব্যবস্থা, যেখানে মহিলারা বক্তব্য প্রদানের স্বাধীনতা পায়, সকল শিক্ষা সংক্রান্ত প্রকারের সুযোগ সুবিধা প্রদান করা, যাতে অভাবপীড়িত আহমদী মেয়েরাও কমপক্ষে প্রাথমিক শিক্ষাটুকু থেকে বঞ্চিত না থাকে।

সারসংক্ষেপ এই যে, ৫২ বছর ব্যাপী খিলাফতকালে তিনি হিন্দুস্তানের অনগ্রসর মহিলাদেরকে তুচ্ছ অবস্থা থেকে এমন সম্মানের আসনে বসিয়েছেন যাকে জগতের সামনে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন হিসেবে উপস্থাপন করা যেতে পারে। আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা বিশ্বের অত্যুন্নত ও স্বাধীন দেশের মহিলাদের জন্যও এক দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছে। আহমদী মহিলাদের আন্তর্জাতিক লাজনা ইমাউল্লাহ্ সংগঠন তাঁর অসাধারণ নেতৃত্বে অনন্য কীর্তি স্থাপন করেছে। এমনকি অ-আহমদীরাও এই সংগঠনের কর্মকাণ্ডের সৌন্দর্য দেখে প্রভাবিত হয়েছেন।

'তানজীম' পত্রিকা ১৯২৬ সালের ২৮ শে ডিসেম্বর-এর সংখ্যায় লেখে-

"লাজনা ইমাউল্লাহ্ কাদিয়ান আহমদীয়া মহিলাদের আঞ্জুমানের নাম। এই সংগঠনের অধীনে সর্বত্র মহিলাদের সংশোধনের জন্য মজলিস গঠন করা হয়েছে। আর এভাবে পুরুষদের পক্ষ থেকে যখনই কোনও প্রকল্পের প্রস্তাব আসে, সেটা মহিলাদের সমর্থনে সফল হয়ে যায়। এই সংগঠনটি সমস্ত মহিলাদেরকে জামাতের লক্ষ্যের সঙ্গে বাস্তবিকভাবে সম্পৃক্ত করেছে। মহিলাদের ঈমান পুরুষদের তুলনায় বেশি খাঁটি ও মজবুত হয়। পুরুষদের তুলনায় মহিলারা ধর্মীয় ভাবাবেগকে বেশি রক্ষা করতে পারে। লাজনা ইমাউল্লাহ্র যে সব কর্মকাণ্ডের সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে, তা থেকে বোঝা যায় যে, আহমদীদের ভবিষ্যত প্রজন্ম বর্তমান প্রজন্মের থেকে বেশি সুদৃঢ় এবং ধর্মপ্রাণ হবে। আর আহমদী মহিলারা এই উদ্যানকে চির সবুজ রাখতে সক্ষম হবে, কালের প্রবাহে যার প্রাকৃতিক সতেজতা ও শ্যামশোভা হারিয়ে যাওয়া অনিবার্য ছিল।"

(তানজীম পত্রিকা, অমৃতসর, ২৮ শে ডিসেম্বর, ১৯২৬)

অনুরূপভাবে লাজনাদের মাসিক পত্রিকা 'মিসবাহ' পাঠ করে 'তেজ' পত্রিকার সম্পাদক জনৈক আর্যসমাজী লেখেন-

"আমার মতে, এই পত্রিকাটি প্রত্যেক আর্যসমাজীর দেখার যোগ্য। এটি অধ্যায়ন করলে আহমদী মহিলাদের সম্পর্কে তাদের যে ভ্রান্তধারণা রয়েছে-অর্থাৎ তারা পর্দার মধ্যে আবদ্ধ থাকে, তাই তারা কোনও কাজ করে না-সেই বিভ্রান্তি নিমেষে দূর হবে আর তারা জেনে যাবে যে, তাদের মধ্যে কিরূপ ধর্মীয় নিষ্ঠা এবং তবলীগের উন্মাদনা রয়েছে। আমরা 'স্ত্রী সমাজ' প্রতিষ্ঠিত করেই তুষ্ট হয়ে গিয়েছি। কিন্তু আমাদের জানা উচিত যে, আহমদী মহিলাদের সর্বত্র যথারীতি সংগঠন তৈরী হয়ে আছে আর যে সব কাজ তারা করছে, তার সামনে আমাদের 'স্ত্রী সমাজ' -এর কাজ কোনোই মূল্য রাখে না। মিসবাহ দেখলে জানা যাবে যে, আহমদী মহিলারা হিন্দুস্তান,আফ্রিকা, আরব, মিশর, ইউরোপ এবং আমেরিকায় কিভাবে এবং কত কাজ করছে। তাদের ধর্মীয় চেতনা অত্যন্ত প্রশংসনীয়, যা দেখে আমাদের লজ্জা পাওয়া উচিত। কয়েক বছর পূর্বে তাদের নেতা একটি মসজিদের জন্য পঞ্চাশ হাজার রুপি একত্রিত করার জন্য আবেদন করেছিলেন আর তাঁর দাবি ছিল, এই অর্থ যেন কেবল মহিলাদের চাঁদা থেকেই পূর্ণ করা হয়। পনেরো দিনেরও কম সময়ে সেই মহিলারা পঞ্চাশ হাজারের স্থানে পঞ্চান্ন হাজার রুপি একত্রিত করে ফেলে।"

মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া:

১৯৩৮ সালে এই মজলিসের গঠন হয়। মজলিসের কাজকর্ম সুষ্ঠু ও সুচারুভাবে পরিচালনা করার জন্য এই সংগঠনকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত কর হয়।যেমন,এতেমাদ,তাজনীদ, মাল, তালিম,তরবীয়ত, ইসলাহ ও ইরশাদ,তাহরীকে জাদীদ,খিদমতে খালক, সেহতে জিসমানী, ওয়াকারে আমাল, সানআত ও তিজারত, ইশাআত, আতফাল।এতেমাদ বিভাগের ইনচার্জকে 'মুতামিদ' এবং অন্যান্য বিভাগের ইনচার্জদের মুহতামিম বলা হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) এই বিভাগগুলি সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে অত্যন্ত মূল্যবান দিক-নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। হুযুর-এর সেই সকল নির্দেশবলী 'মাশআলে রাহ' নামে একটি বিশাল মোটা পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

মজলিস আতফালুল আহমদীয়া:

১৯৪০সালের জুলাই মাসে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) মজলিস খুদ্দামুল আহমদীকে নির্দেশ দেন, এক সপ্তাহের মধ্যে আট থেকে পনেরো বছরের কিশোরদের সংগঠিত করে আতফালুল আহমদীয়া নামে তাদের একটি সংগঠন তৈরী করুন। কেননা এরাই আসলে মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়ার শিশুশালা। ভবিষ্যতে এই শিশুরাই মজলিসের কার্যভার সামলাবে। অতএব, শুরু থেকেই তাদের প্রশিক্ষন হওয়া উচিত।

মজলিস আনসারুল্লাহ্:

১৯৪০ সালে হুযুর (রা.) মজলিস আনসারুল্লাহ্ সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন এবং বলেন,মজলিস আনসারুল্লাহ্ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হল, জীবনের এই অংশে মানুষ যখন কাজে অলস হয়ে পড়ে, তখন ধর্মের কাজে যেন অলস না হয় আর তারা নিজেদেরকে অকর্মন্য ও অকেজো অঙ্গ মনে না করে।

এই মজলিসগুলি একদিকে যেমন সাংগাঠনিক ও তরবিয়তি বিষয়াদিতে অনেক কার্যকর সেবাদানের তৌফিক পেয়েছে, তেমনি জ্ঞানের জগতে তাদের অবদান ঈর্ষনীয়। এই সংগঠনগুলির সফলতা এবং তাদের অসাধারণ পরিণাম এমন স্পষ্ট সত্য ছিল যে, অ-আহমদীরা এর দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারে নি। যেমন জামাত আমদীয়ার বিরোধিতায় কুখ্যাত মজলিস আহরারের মুখপাত্র 'জমজম' জামাতের এই ঈর্ষনীয় সংগঠনের উল্লেখ করে অত্যন্ত হতাশার সুরে লেখে-

"আমাদের দেখুন, কোনও সংগঠন নেই আমাদের। আর তাদের দেখুন, যাদের একের পর এক সংগঠনের সংগঠন রয়েছে। আমরা ভবঘুরে, ছত্রভঙ্গ ও অস্থির হয়ে বেড়াচ্ছি। পক্ষান্তরে তারা একের পর এক বলয়ের মধ্যে, সুদৃঢ় এবং সুসংগঠিত অবস্থায় আছে। আহমদীয়াতের একটা বলয়, যার মধ্যে আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রত্যেকে আহমদী মরকয 'নবুয়ত' -এ একত্রিত হয়ে আছে। কিন্তু সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা এবং কল্যাণ সম্পর্কে সচেতনতার স্তর লক্ষ্য করুন, তারা একটি পরিপূর্ণ সংগঠন নিয়েই ক্ষান্ত হয় নি, এই বিশাল বলয়ের মধ্যে একাধিক ছোটবড় বলয় তৈরী করে প্রত্যেক সদস্যকে এমনভাবে বেঁধে রেখেছে যাতে কেউ নিজের স্থান থেকে নড়তে না পারে। মহিলাদের

এরপর ১৭ পাতায়....

যুগ খলীফার বাণী

যুবক খুদ্দাম ও আতফালদেরকে নিজেদের সাহচর্যের বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন হতে হবে। বন্ধুত্ব তাদের সাথে রাখুন যাদের মধ্যে ঈমান ও নিষ্ঠা রয়েছে, যারা অনৈতিক ও অশালীন কাজকর্মে লিপ্ত নয়।

(রোযনামা আল ফজল, অনলাইন, ২৯ শে নভেম্বর, ২০২২)

দোয়াপ্রার্থী: Humayun Kabir Molla, Nalhati, Birbhum

দিল্লীতে সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.)–এর মজলিসে ইরফান

১৯৪৬ সালের ২৮ শে সেপ্টেম্বর, মগরিব ও এশার নামাযের পর বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা হয়। এছাড়া হুযুর কয়েকজন অ-আহমদী ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন।

মা-মালাকাত আইমানুহুম বলতে কি বোঝানো হয়েছে? এক ব্যক্তির প্রশ্ন করেন যে, والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم বলতে কি বোঝানো হয়েছে আর তাদের সংখ্যা কি ততটাই যতটা স্ত্রীদের?

হুযুর বলেন: মা-মালাকাত আইমানুহুম'-এ সংখ্যা নির্দিষ্ট করা নেই। ইসলাম দাসদেরকে চুক্তি করার অধিকার দিয়েছে। যে মহিলা মনে করে যে, তার মা-বাবা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন আছে, সে এমন অবস্থায় কেন থাকবে? কোনও মহিলা এমন অবস্থায় তখন থাকে যখন তার কোনও ওয়ারিস থাকবে না।

যুদ্ধে ধৃত বন্দীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন- اما من بعد واما فداء। বন্দীদের বিষয়ে দুটি বিকল্প রয়েছে। প্রথম, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করে মুক্তি দেওয়া। দ্বিতীয়, যদি তাদেরকে অনুগ্রহ করে মুক্তি না দিতে পার, যুদ্ধ ঋণ নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দাও। অন্যথায় বন্দী নিজেকে মুক্তি নিবে, এর জন্য চুক্তিপত্র। অর্থাৎ বন্দী বলবে, আমি মুক্তি পেতে চাই, এরজন্য আমি এই পরিমাণ অর্থ দিব, এর বিনিময়ে আমাকে মুক্তি দিতে হবে। যদি না একথা প্রমাণ হয় যে, দাবিদার মানসিক ভারসাম্যহীন কিম্বা উপার্জন করার শক্তি রাখে না,তবে কিস্তিতে নির্ধারিত অর্থ পরিশোধ করবে আর চুক্তি হবে তার সামর্থ অনুসারে। আর চুক্তিপত্র তৈরী হওয়া মাত্রই কার্যত সে মুক্তি লাভ করবে, কিন্তু আইনত স্বাধীনতা তখনই লাভ করবে যখন সে মুক্তিপণ পরিশোধ করে দিবে। তখন তার সমস্ত মালিকানার অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় সেই মহিলাই কারো অধীনস্ত থাকবে যার নিজের ইচ্ছে হবে।

খুদ্দামুল আহমদীয়া দিল্লী-র উদ্দেশ্যে ভাষণ

২৯ শে সেপ্টেম্বর, যোহরের নামাযের পর তিনটের সময় হযরত আমীরুল মোমেনীন (আই.) খুদ্দামুল আহমদীয়া দিল্লীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করেন। তিনি বলেন-

"খুদ্দামরা আমাকে আবেদন করেছে তাদেরকে নসীহত করতে, তাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে। যতদূর আমি মনে করি, কথা বলার দিন অতীত। কথা ঘুমানোর জন্য কিম্বা কথার পর কাজ হয়। এখন ঘুমানোর সময় আমাদের নেই। ইসলামের উপর সকল ধরণের বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্ট নেমে আসছে। ইসলামের লাঞ্ছনা ও গ্লানির উপকরণ ইসলামের জন্য তৈরী হচ্ছে। এই মুহূর্তের ঘুম, ঘুম নয়, আমাদের মৃত্যু হবে। বাকি থাকল অন্য বিষয়টি, কথার পর কাজ করা হোক। তাই এখন কথা অনেক হয়েছে। ১৮৯০ সালে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) মসীহ হওয়ার দাবি করেছিলেন। তাঁর দাবির পর ৫৬টি বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে। যদি এত দীর্ঘ আলোচনাকে কাজে না লাগানো হয়, তবে আর কবে কাজে লাগাবে? কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা বলেন-

الم يان للذين امنوا ان تخشى قلوبهم لذكر الله

অর্থাৎ মোমেনদের জন্য কি এখনও সেই সময় আসে নি, যখন খোদা তা'লার নাম শুনে তাদের হৃদয়ে ভীতি সৃষ্টি হবে? একথাই আমি যুবকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই-

الم يان للذين امنوا ان تخشى قلوبهم لذكر الله

এখনও কি তাদের অন্য কোনও কথার প্রয়োজন আছে? তাদের জন্য কি এখনও কাজের সময় আসে নি?

প্রত্যেক মুসলমানের মধ্যে এই চেতনা থাকা উচিত। যদি তার মাথায় আবেগ ও প্রেরণা থাকে, মনের মধ্যে আকাঙ্খা ও চেতনা থাকে, তবে সে উপলব্ধি করুক যে, তারা অধঃপতিত হয়ে কোথায় পৌঁছে গেছে? আমি আশ্চর্য হই, মুসলমানরা ভূগোল পড়ে, মানচিত্র দেখে, কিন্তু মানচিত্র দেখা মাত্রই কোনও তাদের হৃদয় দুঃখ ভারাক্রান্ত হয় না যে, কোনও এক সময় এই পুরো মানচিত্রই মুসলমানদের দখলে ছিল, কিন্তু আজ মুসলমানরা সর্বত্রই লাঞ্ছিত। একটা যুগ ছিল যখন ইসলামী রঙের মানচিত্র চীন থেকে (পৃথিবীর) শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মুসলমানেরা চীনের উপর রাজত্ব করেছে। জাপানের মহিলারাও আজও তাদের শিশুদের যখন ভয় দেখায়, তখন তারা বলে- চুপ গ্রেট মুরগু- অর্থাৎ চুপ কর, বড় মোগল এসেছে। এছাড়া ইউরোপের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ইসলামের রাজত্ব ছিল। আমেরিকাতেও প্রাচীন মসজিদ পাওয়া গেছে। সেখানকার রাজত্ব মুসলমানরা পাক বা না পাক, কিন্তু মুসলমানরা সেখানে অবশ্যই পৌঁছেছিল।

তাই আজ আমি তোমাদের কি বলব, কোন জিনিসটি অবশিষ্ট আছে যা আমি তোমাদের শেখাব? আকাশ কি তোমাদের শেখায় নি? পৃথিবী কি তোমাদের শেখায় নি? আশপাশের প্রতিবেশীরা কি তোমাদের শেখায় নি? তবে আর কি অবশিষ্ট আছে যা তোমাদেরকে আমল করা থেকে বিরত রাখছে? তোমরা আর কোন দিনের অপেক্ষা করছে। যখন তোমাদের প্রাণের কুরবানী পেশ করা হবে, এই জীবন কোন কাজে আসবে? আজ পৃথিবীতে পথভ্রষ্টতার প্রসার ঘটছে, বিপথগামিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, মিথ্যা ও প্রতারনা প্রবল আকার ধারণ করেছে। এমতাবস্থায় তোমরা যদি নিজেদের জীবনকে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ না কর,তবে আর কবে করবে?

হুযুর তাঁর কথা অব্যাহত রেখে বলেন: প্রত্যেক আহমদী অঙ্গীকার করে যে, ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দিবে। প্রাধান্য দেওয়ার অর্থ অধিকাংশ সময় ধর্মের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা এবং ক্ষুদ্রাংশ অন্যান্য কাজে ব্যয় করা। তোমরা যদি এমনটি কর, তবে সত্যিই তোমরা খুদ্দামুল আহমদীয়া, সত্যিই তোমাদের মাধ্যমে ইসলাম প্রসার লাভ করবে। কিন্তু যদি এমনটি না কর, তবে কাজ তো এমনিতেও হবে।কিন্তু তোমরা খোদা তা'লার সামনে সত্যিকার খাদিম ও বীর সৈন্য হিসেবে উপস্থিত হতে পারবে না। কেননা তোমাদের কর্ম তোমাদের অঙ্গীকারকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে।

অতএব, নিজেদের মধ্যে এক পুণ্যময় পরিবর্তন সৃষ্টি কর এবং কর্ম কর, কেননা, এখন কথা বলার সময় নেই। নিজেদের সংগঠনকে সুদৃঢ় কর। ধর্মের জন্য ত্যাগস্বীকার কর। মানবজাতির সেবা কর।

সব শেষে হুযুর বলেন: আদম থেকে মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) পর্যন্ত আধ্যাত্মিক জামাতগুলির জন্য আল্লাহ্ তা'লা যে রীতি নির্ধারণ করে রেখেছেন, সেই রীতিই আমাদের জন্য নির্ধারিত আছে। খোদাতা'লা হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর জামাতের শত্রু ছিলেন না, হযরত মূসা (আ.), হযরত ঈসা (আ.) কিম্বা হযরত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর শত্রু ছিলেন না, আর তিনি আমাদের আত্মীয় নন। যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা সেই অগ্নিকুন্ডে না নিক্ষিপ্ত হবে, যাতে এঁরা নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সেই সকল বিপদাপদের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হও,যার মধ্য দিয়ে এঁরা অতিক্রান্ত হয়েছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই সব করাৎ দ্বারা তোমাদের চিরে ফেলা হবে, যার দ্বারা এঁদের চেরা হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আদৌ সফলতা পেতে পার না। মৃত্যু এবং কেবল খোদা তা'লার জন্য মৃত্যুতেই জীবন নিহিত।

হুযুর-এর বক্তব্য প্রায় এক ঘন্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। নিজের ভাষায় সেই বক্তব্যের সারাংশ উপস্থাপন করা হল।

(খাকসার, বশীর আহমদ, মুবাল্লিগ, দিল্লী)

(রোজনামা আলফজল, কাদিয়ান দারুল আমান, ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৪৬)

****

মাহদীর বাণী

"সারাটা জীবন যদি পার্থিব কাজেই কেটে যায় তবে পরকালের জন্য কি সঞ্চয় করলে? তাহাজ্জুদ নামাযে অবশ্যই উঠ এবং উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে তা আদায় কর"

(মালফুযাত ১ম খণ্ড)

যুগ ইমামের বাণী

"প্রবৃত্তির আবেগ ও শয়তানী প্ররোচনা থেকে কেবল একটি বিষয়ই মানুষকে বিরত রাখতে পারে যাকে বলা হয় খোদার পরিপূর্ণ পরিচয়।"

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩)

দোয়াপ্রার্থী: Azizur Rahaman Sb, Lalbag, Murshidabad

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি, যিনি পরম রিয্‌কদাতা, শক্তির অধিকারী, সুদৃঢ়। (আয যারিয়াত: ৫৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdur Rahaman Sb. Berhampur, Murshidabad

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.)–এর মজলিসে ইরফান

১৯ই তবুক, কাদিয়ান (সেপ্টেম্বর): আজ সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন আল মুসলেহ মওউদ খলীফাতুল মসীহ আস সানী (আই.) মগরিবের নামযের পর মজলিসে উপস্থিত থেকে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন তা তার সারাংশ নিজের ভাষায় বর্ণনা করা হচ্ছে।

তিনি বলেন: হযরত সুলেমান (আ.) বিদ্রোহ দমন করতে যখন সিরিয়ার অধীনস্ত অঞ্চলে গেলেন, তখন তিনি সম্রাজ্ঞী সাবা (সে মুশরিক ছিল এবং সূর্যের উপাসক ি কে তাঁর আনুগত্য করার আদেশ প্রেরণ করলেন। এই পটভূমি তৈরী হয়েছিল কিছু সীমান্ত বিবাদকে ঘিরে। অন্যথায় তাকে যুদ্ধের প্রতি আহ্বান করেন। কিন্তু সাবা রাণী সন্ধি করাকে প্রাধান্য দিল। সেই বুদ্ধিমতি রাণী নিজের সভাসদদের সঙ্গে পরামর্শ করল। তারা নিজেদের শক্তি এবং যুদ্ধপ্রেমের কথা উল্লেখ করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি রাণীর হাতে ছেড়ে দিল। রাণী বলল

ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذالك يفعلون

অর্থাৎ যখন বাদশাহ নিষ্ঠুরতাপূর্ণভাবে কোনও দেশে প্রবেশ করে, তখন সে দেশের সকল ব্যবস্থাপনাকে ওলটপালট করে দেয়, সম্মানীয় ব্যক্তিদের লাঞ্ছিত করে। রাণী তার কথার মধ্যে যে দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করেছে, তা একেবারে নির্ভুল। কেননা, রাজনৈতিক কৌশল দৃষ্টিপটে নতুন শাসকরা পুরোনো ক্ষমতাসীন দল বা ব্যক্তির পুনরুত্থানের আশঙ্কা ঝেড়ে ফেলতে তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করার চেষ্টা করে এবং রাজত্ব পরিচালনার জন্য অধীনস্থ এবং দুর্বলদের সহানুভূতি এবং সহযোগিতা পাওয়ার জন্য তাদেরকে উচ্চ পদে বসায়। এর বিপরীতে লাঞ্ছিত ব্যক্তি অবশ্যই সম্মানিত হবে, এমনটা আবশ্যক নয়। কিন্তু সম্মানীত ব্যক্তি অবশ্যই লাঞ্ছিত হয়ে তাকে।

এই নিয়ম কেবল ইহজগতেই প্রচলিত নয়, বরং ধর্মীয় বিষয়াদিতেও এমনটিই হয়ে থাকে। কেনা, যখন আম্বিয়াগণ আবির্ভুত হন, তখন সে যুগে ধনী ও বিদ্বানরা অহংকার ও দাম্ভিকতার কারণে তাঁদেরকে গ্রহণ করে না। তারা মনে করে, এমন সাধারণ মানুষ কি নবী হতে পারে? নবী হিসেবে যদি কাউকে আসতেই হত, তবে আমাদের মধ্য থেকে আসত। এই ধরণের কথাবার্তা আম্বিয়াগণকে চিরকালই বলা হয়েছে। ফেরাউন হযরত মূসা (আ.) এই খোঁটাই দিয়েছিল। সে বলেছিল, তুমি কি সেই ব্যক্তি নও, যে আমাদের অন্নে পালিত হয়েছে? হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কেও একই ধরণের খোঁটা দেওয়া হয়েছে। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এই ব্যক্তি কি মসীহ হওয়ার যোগ্য ছিল। আর সত্যি কথা এই যে, আল্লাহ্ তা'লার আম্বিয়াগণ প্রথমতই সাধারণ অবস্থাতেই আবির্ভুত হয়ে থাকেন। সেই অবস্থায় তাদেরকে কোনও গুরুত্ব দেওয়া হয় না। আল্লাহ্ তা'লা যদি কোনও বাদশাহকে নবুয়ত দান করেন আর সে সফল হয়, তবে তার সফলতা সংশয়পূর্ণ হতে পারে। মানুষ মনে করে, সে তো আগে থেকেই ক্ষমতাশালী ছিল, এখন যদি আরও বেশি ক্ষমতাশালী হয়ে উঠে তবে তা এমন আর কি বিষয়? কিন্তু বাহ্যত একজন তুচ্ছ ও দুর্বল মানুষ যখন সমগ্র জগতের বিরোধিতা সত্ত্বেও সফল হয়, তখন সেটাই হয় নিদর্শন। সেই নিদর্শন আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থন এবং তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে।

নিঃসন্দেহে আম্বিয়াগণের নবুয়তের সূচনা হয় অত্যন্ত অসহায় ও নিঃসঙ্গ অবস্থায়। কিন্তু অসহায়ত্ব সত্ত্বেও তাঁরা আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থনে সফলতা অর্জন করেন। আর যারা তাদেরকে লাঞ্ছিত মনে করে, তারা নিজেরাই লাঞ্ছিত হয়। কিন্তু যারা তাঁদেরকে গ্রহণ করে এবং সুখ–দুঃখে তাঁদের সঙ্গী হয়, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে অশেষ কৃপা দান করেন। এবং তুচ্ছ অবস্থা থেকে চির শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মানের সুউচ্চ আসনে বসিয়ে দেন। তারা তখন উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে উদ্ভাসিত হতে থাকে এবং এক অক্ষয় ও অম্লান খ্যাতি লাভ করে। ইহজগতের সম্মান যতই বড় হোক না কেন, খোদা প্রদত্ত সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের তুলনায় তা কোনও মূল্য রাখে না। লক্ষ্য করে দেখ, গভর্ণরের পদ কত বড় জাগতিক সম্মান। কিন্তু আপনাদের মধ্যে থেকে হয়তো বড় জোর দশ শতাংশ মানুষ এমন আছেন, যাদের পাঞ্জাবের বর্তমান গভর্ণর–এর পূর্বের গভর্ণরের নাম মনে আছে। কিন্তু এর বিপরীতে আঁ হযরত (সা.)–এর একজন সাহাবী ছিলেন হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.), যিনি সর্বাধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করার সম্মান লাভ করেছেন–জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি অতি সাধারণ একজন মানুষ ছিলেন। কিন্তু জগতে হয়তো বিরল এমন মুসলমান আছে, যে তাঁর নাম জানে না এবং আবু হুরাইরার সম্মান ও মর্যাদার জন্য তার হৃদয়ে স্থান নেই।

বস্তুত আল্লাহ্ তা'লার দ্বীনের সেবা দানকারীরা কখনও বিনষ্ট হয় না। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর শিষ্য ইয়াকুব এবং পিটার্স সামান্য জেলে ছিল। মানুষ তাদের সঙ্গে বসে খাওয়াও পছন্দ করত না। কিন্তু আজ একজন মহান খৃষ্টান সম্রাটও নিজেকে তাঁর থেকে উত্তম মনে করে না। এছাড়া জাগতিক সম্মান সাধারণ হয়ে থাকে, শুধু তাই নয়, বরং তা অস্থায়ীও বটে। আজ যারা মানুষকে সিংহাসনে বসাচ্ছে, কাল তারাই তাকে নীচে টেনে নামাবে। আজ যাকে রাজত্বের মুকুট পরানো হচ্ছে, আগামী কাল তাকে কন্টকমুকুট পরানো হবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার সম্মান চিরস্থায়ী। আল্লাহ্ তা'লা যাকে সম্মান দান করেন, জগতের কোনও শক্তি তাকে লাঞ্ছিত করতে পারবে না। দুঃখের বিষয় হল, মুসলমানরা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অনুধাবন করে নি। যেভাবে দশ কোটি মুসলমান একশ বছর যাবত ইংরেজদের সেবা করে চলেছে এবং অবলীলায় নিজেদের রক্ত ঝরিয়ে এসেছে, সেভাবে তারা, একদিনের তরে হলেও, যদি আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্যে কুরবানী করত, ইংরেজরা তাদের প্রতি এমন অবজ্ঞাপূর্ণ আচরণ করত না। যেভাবে আজ হিন্দুদের মনোতুষ্টি করছে অথচ মুসলমানদের অবজ্ঞা করছে, তারা আজ তাদের পিছনে পিছনে ঘুরত আর মিনতি করত। কিন্তু পরিতাপ! মুসলমান এমন সুযোগ হেলায় নষ্ট করেছে, তারা খোদা তা'লার দরবারে নতজানু হয় নি। এখনও যদি মুসলমানরা এ বিষয়ের প্রতি মনোযোগ না দেয়, তবে পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ হতে চলেছে। জামাত আহমদীয়া, যারা খোদা প্রেরিত এক প্রত্যাদিষ্ট পুরুষকে মান্য করে, তাদেরকে এ বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত যে, প্রকৃত ও চিরস্থায়ী সম্মান আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এবং ধর্মের সেবার পরিণামে লাভ হয়। আহমদীরা যদি এই সত্য অনুধাবন না করে, এবং এ বিষয়ের প্রতি মনোযোগী না হয়,তবে তা অত্যন্ত দুঃখ ও আশ্চর্যের বিষয় হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন।

(রোজনামা আল ফজল, কাদিয়ান দারুল আমান, ২ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬)

১০ পাতার পর.....

প্রচন্ড অপমান করেছে। অপরদিকে মেয়েটি বলল, আমি ওর মুখ দেখতেও রাজি নই। সে আমার পিতাকে গালমন্দ করেছে।আমি অনেক চেষ্টা করলাম তাদের মাঝে মীমাংসা করার। কিন্তু তাদের উপর কোনও প্রভাব পড়ল না, তারা মীমাংসার জন্য রাজি হল না। যেহেতু নামাযের সময়ে হয়েছিল, তাই আমি নামাযে চলে গেলাম আর আমি তাদেরকে বিদায় দিলাম। তাদের একগুঁয়েমি দেখে নামাযে বিগলিত চিত্তে আল্লাহর কাছে দোয়া করি যে, হে আল্লাহ্! আমাদের জামাতের নৈতিকতার এ কি অবস্থা! তারা এমন তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়াদিকে প্রলম্বিত করছে। পরের দিন সেই মেয়েটিই হাসি মুখে আমার কাছে এল। সে হাসিমুখে সালাম করল, আমি জিজ্ঞাসা করলাম,কি ব্যপার?সে বলল, তিনি আমাকে নিতে এসেছেন আর আমি যাচ্ছি। এরপর স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা তৈরী হয় আর এখন তাদের অনেকগুলো সন্তানও আছে।

অতএব, কাজিদের কর্তব্য হল পিতার মত হয়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা। তারা যেন মনে করে যে, মেয়ের স্বামী আমার ছেলে আর মেয়েটি আমার নিজের মেয়ে। যদি এই মুহূর্তে আমার মেয়ে কোন ভুল করত, তবে আমি কি করতাম।' নিজের মেয়ের জন্য যে বেদনা সে অনুভব করে, একই বেদনা অন্যদের জন্যও হওয়া উচিত। যদি কাজিদের মনে বেদনা তৈরী হয় তবে অবশ্যই অন্যদের মনেও বেদনা তৈরী হবে। স্বামী–স্ত্রীর বিবাদ কোনও দেনা–পাওনার বিবাদের মত নয়, যা কাজি একজন ম্যাজিস্ট্রেটের মত বিচার করতে বসবে, বরং এটা জাতির নৈতিকতার প্রশ্ন। তাই কাজিকে এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে যে, কোনওভাবেই যেন সে মানবীয় নৈতিকতার অনিষ্ট না করে। যখন সে বিচার করতে যায়, তখন তার দৃষ্টিতে যেন এ বিষয়টি থাকে যে, এখানে তার ছেলে বা মেয়ের জীবনের সর্বনাশের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। কখনও সখনও কাজিকে তালাক বা খোলা দেওয়ার অনুমতিও দিতে হবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে নৈতিক অবক্ষয়ের সম্ভাবনা কম থাকবে।আর আশা করা যায়, এক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টির কোনও দিক এতে থাকবে না। "

(আল ফজল, ২৫ শে জুলাই, ১৯৪৬)

****

মহানবী (সা.)-এর বাণী

অতিথিকে গৃহের দরজা পর্যন্ত গিয়ে বিদায় জানানোও সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত। (সুনান ইবনে মাজা)

দোয়াপ্রার্থী: Late-Azima Khatun, From Mirza Enayetulla Sb Harhari, Murshidabad

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.)–এর মজলিসে ইরফান

হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ সানি (আই.) ২২ সে সেপ্টেম্বর দিল্লী আসেন।প্রতিদিন হুযুর মগরিব ও এশার নামাযের পর মজলিসে বসেন এবং তত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ আলোচনা করেন। ২৭ শে সেপ্টেম্বর, হুযুর দরিয়াগঞ্জের আহমদীয়া মসজিদে জুমার নামাযে পড়ান। খুতবায় তিনি বর্তমান যুগে আম্বিয়াগণের জামাতের ন্যায় কুরবানী করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। হুযুরের খুতবার সারাংশ নিজের ভাষায় উপস্থাপন করা হচ্ছে।

জুমআর খুতবার সারাংশ

আমাদের দৃষ্টান্ত অন্যান্য মুসলমানদের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। আমরা সেই সব জামাতগুলির মত নয়, যারা নিজেদের মূল থেকে দূরে সরে গেছে। আমাদের দাবিই হল খোদা তা'লা আমাদের মাঝে রসুল প্রেরণ করেছেন যেভাবে হযরত মূসাকে প্রেরণ করেছেন এবং হযরত ঈসা, হযরত রাম,হযরত বুধ,হযরত যুরাথুস্ত (আ.)কে প্রেরণ করেছেন। তাই আমাদের সঙ্গে অন্যদের কোনও তুলনা নেই। যে জামাত খোদার প্রত্যাদিষ্টের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, আর যে জামাত সম্পর্ক রাখে না– তাদের উভয়ের মধ্যে তুলনা কিভাবে সম্ভব? আমাদের দৃষ্টান্ত হযরত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)–এর জামাতের, হযরত ইব্রাহিম এবং হযরত ঈসা (আ.)–এর জামাতের। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা তাদের মত কুরবানী না করি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের বড় বড় কুরবানীও কোনও মূল্য রাখে না। অন্যান্য জাতির সঙ্গে আমাদের তুলনা করা আমাদের জন্য অসম্মানের। এমনকি এটা আহমদীয়াতের প্রতিষ্ঠাতা এবং মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)–এর জন্য অসম্মানকর।

এ প্রসঙ্গেই হুযুর বলেন: সাহাবাগণ কিভাবে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন, কখনও তারা নিজেদের কাজকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা চিন্তাও করেন নি। স্ত্রী–সন্তানের কথা অবশ্যই চিন্তা করতে হবে, কিন্তু সাহাবাদের কি স্ত্রী–সন্তান ছিল না, তাদের কি খাদ্যের প্রয়োজন ছিল না? তাদের যদি প্রয়োজন থেকে থাকে, তবে আমরা খোদা তা'লার সামনে এমন অভিযোগ করতে পারি না যে, স্ত্রী–সন্তানের জন্য আমরা কুরবানীতে পিছিয়ে ছিলাম। খোদা তা'লা হাজার হাজার মানুষ সামনে এগিয়ে দিয়ে বলবেন, এদের স্ত্রী–সন্তান ছিল না? যখন তাদের জন্য এরা কোনও অন্তরায় ছিল না, তবে তোমাদের জন্য কিভাবে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল? বর্তমানকালে চাকুরীজীবিরা এমন কোন্ বাধার সম্মুখীন হচ্ছে যা সেই যুগের সাহাবাদের সম্মুখীন হতে হত না? কতিপয় সাহাবা তো ক্রীতদাস ছিলেন, যাঁরা ২৪ ঘন্টা কাজ করতেন। ক্রীতদাস সাহাবার মালিক তাদেরকে নামায পড়তে বাধা দিত, তবলীগের কাজে বাধা দিত। আর কেবল তাদেরকে যে কেবল বাধা দেওয়াই হত এমনটি না, বরং এই সব কাজের জন্য তাঁদেরকে মারধরও করা হত। এমন কোন্ বিষয় আছে যা আমাদের জন্য নতুন, কিন্তু পূর্ববর্তীদের জন্য ছিল না?

নবীগণের জামাতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অর্থ হল কুরবানী করা। আমাদের কোনও সদস্যের সময় অপচয় হওয়া উচিত নয়। আমাদের অধিকাংশ সময় ধর্মের প্রচার ও প্রসার এবং শিক্ষার কাজে ব্যয় হওয়া উচিত। আমাদের বৈঠকগুলিতে ধর্মীয় আলোচনা বেশি হওয়া উচিত। আমাদের নামায এবং অন্যদের নামাযের মধ্যে পার্থক্য থাকা উচিত। আমি অনেককে দেখেছি তারা অত্যন্ত দ্রুত নামায পড়ে। অনুরূপভাবে আর্থিক কুরবানীর বিষয়টিও রয়েছে। আমাদের আর্থিক কুরবানী কি সেই ধরণের?এখনও চাঁদার বিষয়ে শিথিলতা রয়েছে। অনেকে তো আবার চাঁদা–ই দেয় না। কেউ কেউ কম হারে চাঁদা দেয়, কেউ আবার নিজের উপার্জন কম করে দেখায়।

হুযুর দিল্লীর জামাতকে বিশেষ করে সম্বোধন করে বলেন–

অতএব, এখানকার মানুষদের দায়িত্ব, কেননা এটা সমগ্র হিন্দুস্তানের রাজধানী। দিল্লী রাজধানী হওয়ার কারণে এখানে মাদ্রাস, বোম্বাই, ইউপি,পাঞ্জাব এবং সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে মানুষ আসে।সেই সকল আগন্তুকরা দিল্লীতে এসে একদিকে যেমন জাগতিক প্রভাব নিয়ে ফিরে যায়,তেমনি ধর্মীয় প্রভাব নিয়ে যাওয়া উচিত। অতএব, এখানকার মানুষ উন্মাদের ন্যায় তবলীগ শুরু করে দিক। আমি দিল্লী জামাতকে নসীহত করছি, আপনারা নিজেদের মর্যাদাকে গুরুত্ব দিন। এটি সেই স্থান যেখানে বড় বড় আওলিয়া সমাহিত আছেন। এছাড়া এটি ভারতের রাজধানী শহর।এটি খোদা তা'লার কৃপা, যিনি আমাদেরকে এমন সময়ে কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন, যখন অন্যরা উদাসীনতা ও অবহেলায় সময়ের অপচয় করছে। আমাদের উচিত দ্রুত খোদা তা'লার পুণ্য দুহাত ভরে গ্রহণ করা, যাতে অন্যদের আগমণে পুণ্যের মূল্য হ্রাস না পায়। অতএব, নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন সৃষ্টি কর। খোদা তা'লা সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হয়ো না এবং পূর্ণ চেষ্টা কর, যাতে খোদা তা'লার বীরযোদ্ধাদের মধ্যে তোমাদের নাম লেখা হয়।

কোঠি ৮ ইয়ার্ক রোডে হুযুর মগরিব ও এশার নামায পড়ান। নামাযের পর হুযুর কয়েক অ–আহমদী অতিথিদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। এরপর হুযুর একটি নিকাহর ঘোষণা করেন।

খুতবা নিকাহ–র সারমর্ম

নিকাহর খুতবায় হুযুর বলেন: সমগ্র বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা বিবাহের উপর নির্ভরশীল। বাহ্যত এই ঘোষণা সাধারণ বিষয় বলে মনে হয়,কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সারা পৃথিবীর রাজনীতি, সরকার প্রশাসান এবং অর্থনৈতিক অবস্থা নিকাহর উপর নির্ভরশীল। প্রতিটি জাতিতেই নিকাহ বা বিবাহের প্রথা আছে আর উপলক্ষ্যে আনন্দ উদযাপিত হয়। কোথায় গান বাজনা হয়, হিন্দুদের মধ্যে মিষ্টান্ন দ্বারা পুতুল তৈরী করা হয়। সাতবার প্রদক্ষিণ করা হয়। এটা নিঃসন্দেহে একটা আনন্দের বিষয়। কিন্তু ইসলাম বিবাহ উপলক্ষ্যে কেবল আনন্দ উদযাপনের শিক্ষা দেয় নি, বরং পুরুষ ও মহিলাকে গুরুত্বসহকারে বিষয়টি প্রণিধান করার নির্দেশ দিয়েছে। ইসলাম মতে বিবাহ থেকেই হাজার হাজার পুণ্য কিম্বা পাপের জন্ম হতে পারে।

হুযুর বলেন: আম্বিয়াগণ জন্ম মহিলাদের গর্ভেই আর তাদের শত্রুরাও মহিলাদের গর্ভেই জন্ম নেয়। ফেরাউনের পিতা–মাতার যখন বিবাহ হয়েছিল, তখন নিশ্চয় অনেক ধুমধামের সঙ্গে হয়ে থাকবে। লক্ষ লক্ষ টাকা যৌতুক দেওয়া হয়েছিল, সারা দেশে আলোক সজ্জা করা হয়েছিল। রাজপুত্রের বিবাহ বলে কথা! কিন্তু কারো মনে এমন চিন্তা আসে নি যে, এত ধুমধাম করে যার বিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাদের গর্ভের সেই সন্তানের জন্ম হবে যাকে চিরকাল অভিশাপ দেওয়া হবে।

এই কারণেই ইসলাম নিকাহর সময় এই উপদেশ দেয় যে, ভবিষ্যতে এই কাজটির বড় বড় পরিণাম পাবে। তাই দোয়ার মাধ্যমে এই কাজটি সম্পাদন কর। বস্তুত, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ্য। তাই দোয়ার মাধ্যমে এই কাজে হাত দেওয়া উচিত, যাতে খোদা তা'লা স্বয়ং হাফিজ ও নাসির হন।

সব শেষে হুযুর দোয়া করেন। এরপর তিনি বলেন, আমার মাথা ব্যাথা করছে, তাই বেশিক্ষণ বসতে পারব না।

(খাকসার, বশীর আহমদ, মুবাল্লিগ সিলসিলা, দিল্লী)

(রোজনামা আল ফজল, কাদিয়ান দারুল আমান, ২রা অক্টোবর, ১৯৪৬)

নিয়মিত কুরআন করীম তিলাওয়াত করুন

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মু'মেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) বলেন:

" আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমরা আহমদী মুসলমানরা সব থেকে সৌভাগ্যবান মানুষ। কেননা যুগের ইমাম হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে মান্য করার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে।.....এটি আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর আশিসময় এবং পরিপূর্ণ শরিয়তের মাধ্যমে আমাদের পথ–প্রদর্শন করে থাকেন, যা তিনি মহানবী (সা.)–এর উপর কুরআন করীম রূপে অবতীর্ণ করেছেন।..... অতএব কুরআন করীম অধ্যয়ন করা আমাদের সকলের জন্য আবশ্যক। কেননা, কুরআন আমাদেরকে সফলতা এবং মুক্তির দিকে পথ–প্রদর্শন করে। এটি সেই আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃ যা আমাদেরকে সত্যিকার অর্থে ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়া শেখায়। এটিই আমাদের শিক্ষক এবং জীবন–বিধি।..... অতএব নিয়মিত তিলাওয়াত করার বিষয়টি আমাদেরকে সুনিশ্চিত করতে হবে এবং এও নিশ্চিত করতে হবে যে আমরা যেন এর নিগূঢ় তত্ত্বকে শেখার চেষ্টা করি এবং এর যাবতীয় শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করি। আজ যদি আমাদের মন–মস্তিষ্ক পূত ও পবিত্র হতে পারে এবং আমাদের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন সাধন সম্ভব হতে পারে, তবে তা কেবল আল্লাহ্ তা'লার বাণী পাঠ করে তা অনুধাবন করার মাধ্যমেই সম্ভব হতে পারে। "

(যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল ইজতেমা উপলক্ষ্যে সমাপনী ভাষণ, প্রদত্ত, ২৬ শে ডিসেম্বর, ২০১৬)

" একজন মানুষ, সে যে ধর্মের অনুসারীই হোক না কেন মানুষ হিসেবে সবাই একই সম্প্রদায়ভুক্ত। তাই কাউকে অবজ্ঞা করার কোন সুযোগ ইসলামে নেই।"
[হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)]

যুগ ইমামের বাণী

যার মধ্যে ইসলামের সম্মানের জন্য আত্মাভিমান নেই, খোদা তা'লা তার সম্মান ও আত্মাভিমানের পরোয়া করেন না।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১১)

দোয়াপ্রার্থী: Late Sawkat Bibi & Jahanara Bibi From- Sabina Parveen. Banshra, 24 PGS (s)

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.)–এর মজলিসে ইরফান

দিল্লী, ২৮ শে ডিসেম্বর: হযরত আমীরুল মোমেনীন (আই.) আজ জোহর ও আসরে নামায কোঠি ৮ ইয়ার্ক রোডে পড়ান। নামাযের পর হুযুর মজলিসে আসেন,যেখানে কয়েকজন হিন্দু ও অ–আহমদী সদস্য নিজেদের প্রশ্ন করে এবং হুযুর সেই সব প্রশ্নের উত্তর দেন।নিম্নে সারাংশ দেওয়া হল।

দোয়ার মধ্যে প্রভাব

একজন হিন্দু ব্যক্তি প্রশ্ন করেন যে, যদি দোয়ার মধ্যে প্রভাব থাকে, তবে এমন দোয়া কেন করেন না যাতে হিন্দু ও মুসলিমদের মাঝে মীমাংসা হয়ে যায়। আপনি এতদূর থেকে নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য এসেছেন, আপনার যদি খোদার সঙ্গে সম্পর্ক থাকে, তবে আপনি দোয়া করুন, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যেন ঐক্যতান তৈরী হয়ে যায়, আপনার এখানে আসার প্রয়োজন কি?

হুযুর বলেন: প্রথমত প্রশ্ন হল, যদি খোদা থাকেন, যেভাবে আপনারা মনে করেন, তবে আপনার আমার কাছে আসার প্রয়োজন কি ছিল? খোদা আমাকে কাদিয়ানেই আটকে দিতেন আর নিজেই এই কাজ করতেন। এর থেকে বোঝা যায়, আপনার এই প্রশ্নটি সঠিক নয়। বরং খোদা তা'লার কর্মকাণ্ড অন্য ভাবে পরিচালিত হচ্ছে। আপনি যেভাবে বলছেন, বিষয়টি যদি এমনই হত,তবে চেষ্টারও কোনও প্রয়োজন ছিল না, আর দোয়ারও কোনও প্রয়োজন ছিল না। কেননা খোদা তা'লা নিজেই কাজ পরিচালনা করতে পারেন। তিনিই নিজেই সব কিছু করে দেন। কিন্তু খোদা তা'লার কাজ এভাবে চলে না। খোদা তা'লা যদি নিজেই সব কাজ করে দেন, তবে বান্দাদের এ বিষয়ে আগ্রহ তৈরীর প্রশ্নই উঠত না, আর কেউ কোনও পুণ্যের অধিকারীও হতে পারত না। যেমন, রাম কিম্বা কৃষ্ণ জি যে সকল কাজ করেছেন,যদি আল্লাহ্ নিজেই সেগুলি করে দিতেন, তবে কৃষ্ণ জির গুরুত্ব বোঝা যেত না। কৃষ্ণজি–র এই কাজের মাধ্যমে একদিকে যেমন খোদা তা'লার সৌন্দর্য দেখতে পাওয়া গেছে, তেমনি কৃষ্ণ জি–র বীরত্ব ও সাহসও প্রকাশ পেয়েছে। তাই আল্লাহ্ তা'লা একজন দুর্বল মানুষের দ্বারা কোন কাজ নেন,যার মাধ্যমে খোদা তা'লার সৌন্দর্যও প্রকাশিত হয় এবং মানুষের সাহস ও বীরত্বও বোঝা যায়।

প্রশ্নের উত্তর:

এক বন্ধু কয়েকটি প্রশ্ন লিখে হুযুরের কাছে উপস্থাপন করে। সেগুলির মধ্যে থেকে কয়েকটির উত্তর সংক্ষেপে দেওয়া হল। একটা প্রশ্ন ছিল যে, মৃত্যুর পর আত্মার সঙ্গে কি করা হবে?

হুযুর বলেন: এ সম্পর্কে আমার লেখা 'আহমদীয়াত' নামে পুস্তকে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আত্মা সম্পর্কে আমাদের ধর্মবিশ্বাস হল, আত্মা হল একটা নির্যাস যা মানবদেহ থেকে সৃষ্টি হয়। অতঃপর তা দেহের সমান্তরাল অস্তিত্ব লাভ করে। তাই আত্মা কখনও দেহ থেকে পৃথক হয় না, সব সময় কোনও না দেহে বাস করে। আত্মা এই পার্থিব দেহ থেকে পৃথক হয়ে নতুন প্রকারের দেহ লাভ করে। ইসলাম মতে, মৃত্যুর পরও অগ্রগতি থেমে থাকে না, যতদিন বিচার দিবস না আসে। যারা পাপাচারে লিপ্ত থাকে, তারা শাস্তি ভোগ করে আর যারা পুণ্য কর্ম করে তারা পুরস্কার লাভ করে। খোদা তা'লার পক্ষ থেকে শাস্তি কোনও বিশেষ কিছু নয়। বরং মানুষ নিজেদের কর্ম অনুসারে যা কিছু অর্জন করে,সেটা থেকেই সে কষ্ট ভোগ করে কিম্বা সুখ লাভ করে। খোদাতা'লা কোনও কিছু মন্দ সৃষ্টি করেন নি। আর্সেনিক এক প্রকার বিষ এবং তা অত্যন্ত বিপজ্জনক বস্তু। কিন্তু তা বহু রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। গন্ধক কিরূপ মারাত্মক, কিন্তু এর দ্বারা কত রোগব্যধির চিকিৎসা হয়। অনুরূপভাবে পরকালের জন্য সব কিছু ভল। মানুষের অভ্যন্তরীণ ব্যধি কাউকে খারাপ রূপ দেয় আবার কাউকে সুন্দর রূপ দেয়। মানুষ নিজের শক্তিবৃত্তির অপপ্রয়োগ করলে সে কষ্ট ভোগ করে। আমরা পৃথিবীতেও দেখি, পার্থিব বিষয়াদি অযথা ও কম=বেশি ব্যবহার করলে দুঃখ–কষ্ট ও ক্ষতি সহন করতে হয়। দোযখ চিরস্থায়ী নয়। এটা ঠিক যেন কোনও একটা চিকিৎসালয়। অসুস্থ অবস্থায় মানুষ হাসপাতালে থাকে। সুস্থ হওয়ার সেখান থেকে বের হয়ে আসে। অনুরূপভাবে মানুষ যখন খোদা তা'লার প্রতি মনোযোগী হয়, নিজের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে,তখন সে জান্নাত লাভের যোগ্যতা অর্জন করে। যে সব জিনিস পূর্বে তার কাছে অপছন্দনীয় ছিল, সেগুলো ভাল লাগতে শুরু করবে। কেননা অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের কারণে বহিরাঙ্গেও পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে। জান্নাত হল সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের অবস্থা এবং খোদা তা'লার নৈকট্য প্রাপ্তির অবস্থা আর এই নৈকট্যের অবস্থা চিরন্তন। কেননা, খোদা তা'লার নৈকট্যভাজনদের দূরে সরিয়ে দেওয়া তাঁর মর্যাদা পরিপন্থী।

ইসলামী ইবাদতসমূহের সঙ্গে চাঁদের সম্পর্ক

একটি প্রশ্ন করা হয় যে,ইসলামের বিভিন্ন উৎসব কিম্বা ইবাদতের ক্ষেত্রে চাঁদ কেন যুক্ত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: চাঁদের সঙ্গে সম্পর্কের কারণে ইবাদতসমূহ ক্রমান্বয়ে আবর্তিত হতে থাকে।সূর্যের চারদিকে আবর্তিত হয় না। যেমন, রোযা। চাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার কারণে রোযা জানুয়ারী মাসেও হবে, ফেব্রুয়ারীতেও হবে। বস্তুত, প্রত্যেক মাসে, প্রত্যেক সপ্তাহে এবং প্রতিটি দিনে রোযা আসবে। কোনও একটি মাস, সপ্তাহ কিম্বা দিন বাকি থাকবে না, যাতে রোযা আসবে না। অনুরূপভাবে, হজ্জ। এমন কোনও মাস থাকবে না,যে মাসে হজ্জ হবে না। কোনও এমন দিন হবে না,যেদিন হজ্জ হবে না। অতএব, (চাঁদের সাথে) এই সম্পর্ক এ জন্য যে,যাতে খোদা তা'লার ইবাদত সারা বছর আবর্তিত হতে থাকে।

(খাকসার, বশীর আহমদ, মুবাল্লিগ সিলসিলা, দিলী)

(রোযনামা আলফজল, কাদিয়ান দারুল আমান,৩রা অক্টোবর,১৯৪৬)

****

১৩ পাতার পর....

স্থায়ী একটি সংগঠন হল লাজনা ইমাউল্লাহ। এই সংগঠনের স্থায়ী একটা ব্যবস্থাপনা রয়েছে। সালানা জলসার সময় তাদের পৃথক জলসা সালানার ব্যবস্থা হয়। খুদ্দামুল আহমদীয়া যুবকদের একটি পৃথক সংগঠন।পনেরো থেকে চল্লিশ বছরের জামাতের প্রত্যেক সদস্য খুদ্দামুল আহমদীয়ার অন্তর্ভুক্ত হওয়া অনিবার্য।

চল্লিশোর্দ্ধ সদস্যদের 'আনসারুল্লাহ্' নামে আরও একটি স্থায়ী বলয় রয়েছে, চৌধুরী স্যর মহম্মদ জাফরুল্লাহ্ খানও এর অন্তর্ভুক্ত। আমি এমন পরিস্থিতিতে মুসলমানদের কাছে কেবল এতটুকু জানতে চাই যে, তোমাদের কি এখনও জেগে ওঠার এবং সংগঠিত হওয়ার সময় আসে নি? তোমরা এই একাধিক সমরাঙ্গণের মোকাবেলায় কোনও একটি সেনাদলও কি প্রস্তুত করেছ? প্রতিপক্ষ মহিলাদেরকে পর্যন্ত জিহাদের এনে দাঁড় করিয়েছে।.... আমার মতে আমাদের বিমূঢ়তা, যুদ্ধের ময়দানে পরাজয় ও পশ্চাদপদতার সব থেকে বড় কারণ সততার ত্রুটিপূর্ণ এই মান। "

(জমজম, লাহোর, ২৩ শে জানুয়ারী, ১৯৪৫)

বক্তব্যের শেষে সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)–এর প্রশংসায় অ–আহমদীদের কতিপয় অভিমত উপস্থাপন করব। মৌলানা গোলাম রসুল মেহের, যিনি পেশায় একজন সাংবাদিক ও ইতিহাসবিদ ছিলেন, একাধিকবার হুযুরের নির্দেশনায় সেবা করার তৌফিক পেয়েছেন, তিনি লেখেন–

"আপনাদের কোনও পুস্তকে এই মহান ব্যক্তির কর্মকাণ্ডের পরিপূর্ণ প্রতিফলন হতে দেখি না। আমি তাঁকে কাছে থেকে দেখেছি, একাধিক বার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করেছি। ব্যক্তিগতভাবে মতামত বিনিময় করেছি। মুসলিম জাতির জন্য তিনি তো ছিলেন মূর্তিমান ত্যাগ। একবার আমাকে রাতারাতি কাদিয়ান গিয়ে হযরত সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করতে হয়। সেই দৃশ্যটি এখনও আমার চোখের সামনে ভাসে। মানবতার জন্য তাঁর হৃদয়ে ভীষণ বেদনা ছিল আর যেখানেই মুসলিম জাতির উন্নতি ও সমৃদ্ধির কোনও বিষয় তাঁর সামনে আসত, তাঁর বাস্তবায়নযোগ্য প্রস্তাব আমাদের সাহস বৃদ্ধির কারণ হত। এমন পরিস্থিতিতে তাঁর রন্ধ্র রন্ধ্র জাতির বেদনায় ব্যকুল হয়ে উঠত। তাঁর মধ্যে আমি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের নামমাত্র দেখি নি। মির্যা সাহেব ভীষণ বিচক্ষণ বক্তি ছিলেন। আমি পাক ও হিন্দুস্তানে এমন রাজনীতিক বা ধর্মীয় নেতা দেখি নি, রাজনীতিতে যাঁর বুদ্ধি এমন কাজ করে, যেমনটি মির্যা সাহেবের বুদ্ধি কাজ করত। মূল্যবান পরামর্শ, স্পষ্ট প্রস্তাব এবং সঠিক গতিপথ মেনে কর্মসূচি পালন করা তাঁর বিশেষত্ব ছিল। পরিতাপ! মুসলমান জাতি মির্যা সাহেবের মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হল। বিরোধিতার প্রবল ঝড় সত্ত্বেও মির্যা সাহেবকে আমি কখনও বিষন্ন ও নিস্তেজ থাকতে দেখি নি। মির্যা সাহেবের হৃদয়ের জ্যোতি নিরন্তন প্রজ্জ্বলিত থেকেছে। আমি হতাশ ও বিষাদগ্রস্ত চেহারা নিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য যেতাম, আর যখন তাঁর ঘর থেকে বের হয়ে আসতাম, তখন মনে হত হতাশার কালো মেঘ সরে গেছে আর উদ্দেশ্যে সফলতা সামনে দেখা যাচ্ছে। যুক্তিযুক্ত ও বাস্তবায়নযোগ্য কথা বলতেন আর কেবল এতটুকুই নয়, সব ধরণের ত্যাগ স্বীকার করতেন ও সহায়তার হাতও বাড়িয়ে দিতেন, যার ফলে আমার মাঝে সাহস ও উদ্যম তৈরী হত। (ইকবাল আর আহমদীয়াত, পৃ: ৫০২)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা)–এর নির্দেশনাবলী অনুসারে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

****

দিল্লীতে সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.)–এর মজলিসে ইরফান (প্রশ্নোত্তর সভা)

১৮ই তবুক, কাদিয়ান (সেপ্টেম্বর): আজ সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন আল মুসলেহ মওউদ খলীফাতুল মসীহ আস সানী (আই.) মগরিবের নামযের পর মজলিসে উপস্থিত থেকে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন তা তার সারাংশ নিজের ভাষায় বর্ণনা করা হচ্ছে।

আমি কিছুকাল পূর্বে নসীহত করেছিলাম যে, নামায অত্যন্ত ধীরে সুস্থে এবং সম্মানের সাথে পড়া উচিত এবং এরপর সুন্নত অনুসারে আল্লাহ্ তা'লার তসবীহ ও তাহমীদ করা উচিত। কিছু সময় এই উপদেশ পালন করা হয়েছে। কিন্তু এখন আমি পুনরায় লক্ষ্য করছি, ক্রমশ সেটা মানুষ ভুলে যাচ্ছে। আর আমার এক রাকাত পড়া হতে না হতেই নীচে থেকে তাদের আসার পায়ের শব্দ শোনা যায়। অথচ অনুমান করা যায়, তারা নামাযে পরে যোগ দেয়, কিন্তু উপরে সবার আগে চলে আসে। তাদের আগে যাওয়ার অর্থ, তারা আমার এক রাকাতের মধ্যেই পুরো নামায পড়ে ফেলেছে এবং পরে দুই রাকাত সুন্নতও পড়ে এবং যিকর করেছে এবং দৌড়ে উপরে এসেছে। আর এভাবে তারা আরও একটি নির্দেশ অমান্য করেছে। কেননা আঁ হযরত (সা.) নামাযে দৌড়ে এসে যোগ দিতে নিষেধ করেছেন। আর যে নামাযে দ্রুত দৌড়ে এসে যোগ দেওয়া হয়, তিনি বলেছেন, সেটি নামাযই নয়। এক ব্যক্তি দ্রুত নামায পড়ছিল আর নামাযের বিভিন্ন অংশ পুরো সম্পাদন করছিল না। হুযুর (আ.) কে বললেন- صل فانك لم تصل অর্থাৎ তোমার নামায হয় নি। এবং তকে বললেন, প্রতিটি ভাবভঙ্গি অত্যন্ত ভক্তি, মর্যাদা এবং সুস্থ মস্তিষ্কে না পড়লে নামায হয় না। যত্নসহকারে নামায না পড়লে নামায হয় না। এছাড়া এটাও অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, অনেকে আমাদের মজলিসে আসার জন্য আমাদের নামায নষ্ট করে দেয়। অথচ এই মজলিস তো আমার সাহচর্য, পক্ষান্তরে নামায হল আল্লাহ্ তা'লার সাহচর্য। কতই না হতভাগা সেই ব্যক্তি, যে তুচ্ছ বিষয়ের জন্য উৎকৃষ্ট বস্তু ত্যাগ করে। আর আল্লাহ্ তা'লার মজলিস থেকে পালিয়ে এসে আমাদের মজলিসে আসা কি তাঁর মজলিসের অসম্মান করা নয়?

তাছাড়া এটাও অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, একটি বিষয়ের গুরুত্ব যখন স্পষ্ট করে দেওয়া হয় এবং তাকিদও করে দেওয়া হয়,তখন কেন তাকে ভুলে যাওয়া হয়? অতএব এমন নামায কেবল লোকদেখানো নামায এবং তা লাঞ্ছনা ও অপমানের কারণ। আর আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টির কারণ হয়।

একমাত্র সেই ইবাদত আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও সন্তুষ্টি আকর্ষণ করতে পারে যা অনুনয় বিনয় ও বিগলিত চিত্তে সম্পাদিত হয়। অবশ্যই জামাতের সময় দীর্ঘ নামায পড়াতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে এই নির্দেশ প্রযোজ্য নয়। বরং ব্যক্তিগত নামাযের ক্ষেত্রে আঁ হযরত (সা.)এর সুন্নত হল, তিনি রাত্রে নামাযে এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, তাঁর পা ফুলে যেত। তিনি প্রায় তিন ঘন্টা ধরে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন।

নামাযের জন্য দৌড়ে আসা কোনও ব্যক্তির নামাযের প্রতি আগ্রহ ও ভালবাসা প্রমাণ করেনা। বরং এতে নামাযের অসম্মান হয়। আঁ হযরত (সা.)-এর আদর্শ নামাযের পর তসবীহও তাহমীদ করা উচিত। এমন স্পষ্ট কথাও কি আপনারা বুঝতে পারেন না যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) তসবীহ ও তাহমীদের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু আপনাদের প্রয়োজন নেই? রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর সুস্থ মুস্তিষ্কে নামায পড়ার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু আপনাদের প্রয়োজন নেই। অথচ আল্লাহ্ তা'লার কৃপাকে তিনি যতটা আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন, তার জন্য আমাদেরকে শত সহস্রগুণ বেশি পরিশ্রম করা প্রয়োজন।

এরপর হুযুর সেই সব সদস্যদের উঠে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিলেন, যারা হুযুরের পূর্বের নির্দেশ মেনে আবশ্যিকভাবে ৩৩বার সুবহানাল্লাহ্, ৩৩বার আল হামদোলিল্লাহ এবং ৩৪বার আল্লাহু আকবার পাঠ করছিলেন। কিন্তু এমন সদস্যদের সংখ্যা কম ছিল। এরপর হুযুর প্রত্যহ আবশ্যিকভাবে বারো বার দরুদ শরীফ এবং তসবীহ পাঠকারীদের উঁঠে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তাদের সংখ্যাও কম ছিল। এতে হুযুর দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, সেই সত্তা, যাঁর অনুগ্রহরাজির নীচে আমরা চাপা পড়ে আছি, মাথা তুলতে পারি না, তাঁর কৃপা ও অনুগ্রহের কিঞ্চিত প্রতিদানও যদি আমরা দরুদ ও তাহমীদ হিসেবে পেশ করতে না পারি, তবে তা বড়ই দুঃখ ও লজ্জার!

হুযুর বলেন: যেভাবে আমাদের পার্থিব জীবন টিকিয়ে রাখতে হলে পার্থিব খাদ্যের প্রয়োজন হয়, অনুরূপে আমাদের আত্মাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে আধ্যাত্মিক আহারের প্রয়োজন।

আর বস্তুত, তাসবীহ ও তাহমীদ এবং আল্লাহ্ তা'লার যিকর ছাড়া সেই খাদ্য গায়েই লাগে না আর তাতে দেহের বিকাশ হয় না। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সূরা মোমেনের ব্যাখ্যায় বারাহীনে আহমদীয়ার ৫ম ভাগে এর দর্শন বর্ণণা করেছেন। তিনি বলেন, আমাদের আত্মা আমাদের দেহ থেকেই সৃষ্টি হয়। আর এটাই সেই বিষয় যা সকল 'তাসাউফ'-এর মূল। এর ব্যাখ্যা করা হলে হাজার হাজার 'তাসাউফ'এর পুস্তক এর উপর উৎসর্গিত হতে পারে। এমন আহার যার সঙ্গে তসবীহ ও তামহীদ করা যায়, তা কেবল দৈহিক আহার থাকবে না, বরং আধ্যাত্মিক আহারে পরিণত হবে। যেভাবে শরবতের বিভিন্ন অংশ দেহের বিভিন্ন অংশে পুষ্টি জোগায়, যেমন পানি পেট পরিস্কার করার কাজ করে। আর মিষ্টি শক্তি জোগায়। অনুরূপভাবে সেই খাদ্য যার সঙ্গে তাসবীহ ও তামহীদের মিশ্রন থাকবে তার মধ্যে থাকা খাদ্য পেটে গিয়ে শরীরের বিকাশ ঘটায় আর তসবীহ ও তামহীদ তার আত্মা হয়ে ওঠে কিম্বা তার আধ্যাত্মিকতাকে বৃদ্ধি করে।

একজন মানুষ আল্লাহ তা'লাকে অসংখ্য নেয়ামতের কারণে তাঁর তসবীহ ও তামহীদ করতে বাধ্য হয়। আমি আশ্চর্য হই, কিভাবে আল্লাহ্ তা'লা সমগ্র জগতকে আমাদের জন্য নিযুক্ত করেছেন এবং জগতের সকল নেয়ামত আমাদের জন্য হাতের মধ্যে এনে দিয়েছেন। আমরা কেবল কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের মাধ্যমেই এর প্রতিদান দিতে পারি। কিন্তু দুঃখের বিষয় হবে, যদি আমরা এটাও না করি। আযানের পর হুযুর বলেন, আমি বলছিলাম, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন, খাদ্যই আসল বিষয়, যা থেকে আত্মা সৃষ্টি হয়। আর সংশোধনের সর্বোত্তম পথ হল, উৎসের সংশোধন করা, বৈধ রিজক থেকে আহার করা এবং বৈধ সম্পদের উপরই জীবন অতিবাহিত করা। পৃথিবীতে যেভাবে বৈধ রিজক মূল্য দিয়ে ক্রয় করতে হয়। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'লা, যিনি প্রকৃত রিযকদাতা, তাঁর রিযকের মূল্য দেওয়া উচিত। আর রিযকের মূল্য হল আল্লাহ্ তা'লার তসবীহ ও তাহমীদ করা, বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম বলে আহার শুরু করা, মাঝে একবার সুবহানাল্লাহ পাঠ করা এবং আহার শেষে আলহামদোলিল্লাহ উচ্চারণ করা।

(রোযনামা আল ফজল, কাদিয়ান দারুল আমান, ২০ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬)

২য় খুতবার শেষাংশ....

কিন্তু নিজেদের ঈমানকে নষ্ট হতে দেন নি, ঈমানকে অক্ষুন্ন রেখেছেন। এরপর এই ধারণা করা যে, পরীক্ষায় যারা সফলভাবে উত্তীর্ণ হয় তাদের জীবদ্দশায় আল্লাহ্ তা'লা এমন এক প্রতিশ্রুত ব্যক্তি প্রেরণ করবেন যার সত্যতার নিদর্শন তার দাবির দীর্ঘকাল পর প্রকাশিত হবে, এর অর্থ এটি দাঁড়ায় যেন, মু'মিনদের পুনরায় অবিশ্বাসের মুখে ঠেলে দেওয়া আর সাহাবীদের পুনরায় অবিশ্বাসের জগতে ফিরিয়ে দেওয়া। এমনটি করা আল্লাহ্ তা'লার সুন্নত বা রীতি পরিপন্থি। তাই আল্লাহ্ তা'লা হযরত মুসলেহ্ মওউদ সম্পর্কে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে গঠিত যে জামাত ছিল সেই জামাতের সামনে এবং তাদের জীবদ্দশায় ও তাদের উপস্থিতিতে মুসলেহ্ মওউদ আসার কথা অর্থাৎ সাহাবীদের সময় তার দাবি করার কথা। তাই তিনি এ রীতি অবলম্বন করেন যে, প্রথমে তাকে জামাতের খলীফা বানিয়ে তাদেরকে তার আনুগত্য করিয়ে সেই সব ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন যা তার সম্পর্কে বলা হয়েছে। আর জামাতের সামনে যখন তা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে যায় তখন তাকেও অর্থাৎ খলীফাতুল মসীহ্ বা মুসলেহ্ মওউদ যার হওয়ার ছিল তাকেও স্বর্গীয় সংবাদের ভিত্তিতে অবহিত করেন যেন আকাশ এবং পৃথিবী এই উভয়টির স্বাক্ষ্য এক জায়গায় সমবেত হয় আর মু'মিনদের জামাত যেন কুফর এবং অস্বীকারের কলুষ থেকে নিরাপদ থাকে।

(খুতবাতে মাহমুদ, ২৫তম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৬৯-৯৫ থেকে সংকলিত)

আল্লাহ্ তা'লা এ যুগেও সবার ঈমানকে সুরক্ষিত রাখুন, সব আহমদীর ঈমান সুরক্ষিত থাকুক আর কুফর এবং অস্বীকারের কলুষ থেকে তাদের সব সময় মুক্ত রাখুন। জামাতের বন্ধুদের হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর জ্ঞান এবং তত্ত্বপূর্ণ রচনাবলী থেকে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। এসব বই-পুস্তক রয়েছে উর্দূতেও রয়েছে এবং ইংরেজীতে রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে তা পাঠের তৌফিক দিন।

****

যুগ ইমামের বাণী

কেবল মৌখিক বয়াতের অঙ্গীকারের কোনই মূল্য নাই, যে পর্যন্ত দৃঢ়-চিত্ততার সহিত উহার উপর আমল করা না হয়।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Late Hasan Laskar From-Kutubuddin Laskar Sb. Banshra, 24 PGS (s)

জুমআর খুতবা

২০ ফেব্রুয়ারী জামাতের ইতিহাসে মুসলেহ মওউদ দিবস হিসেবে পরিচিত।

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-কে তাঁর নিজের এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণের সংবাদ দেওয়া হয়েছিল যিনি ধর্মের সেবক হবেন। দীর্ঘজীবি হবেন এবং আরও অনেক অসাধারণ গুণাবলীর অধিকারী হবেন।

এরপর আপন পর সবাই দেখেছে যে, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী কত মহিমার সাথে পূর্ণতা লাভ করেছে। আর যুগ প্রমাণ করেছে যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নস্থল বা যার সত্তায় তা পূর্ণ হয়েছে তিনি ছিলেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী।

হযরর মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর খুতবাসমূহ থেকে ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া সম্পর্কে বিভিন্ন আঙ্গিকের উপর ঈমান উদ্দীপক বর্ণনা।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ-এ প্রদত্ত ১৯ ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৬, এর জুমুআর খুতবা (১৯ তবলীগ,১৩৯৫ হিজরী

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহুদ, তাউয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, ২০শে ফেব্রুয়ারী দিনটিআহমদীয়া মুসলিম জামাতে মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষাপটে সুপরিচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে তাঁর এক অসাধারণ পুত্রের জন্মের শুভ সংবাদ দেওয়া হয়েছিল যিনি ধর্মের সেবক হবেন, দীর্ঘজীবি হবেন এবং আরো বহু গুণাবলীর আধার হবেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই ভবিষ্যদ্বাণীর গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন যে, "এটি কেবল এক ভবিষ্যদ্বাণীই নয় বরং এটি এক মহান ঐশী নিদর্শনও বটে যা মহা সম্মানিত ও প্রতাপশালী খোদা আমাদের সম্মানিত রসূল,মমতাশীল এবং প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য প্রকাশ করেছেন। সত্যিকার অর্থে এই নিদর্শন এক মৃতকে জীবিত করার চেয়েও শত গুণ উন্নত, মহান, শ্রেয়, শ্রেষ্ঠ, অধিক উত্তম ও অধিক সম্পূর্ণ। কেননা মৃতকে জীবিত করার বাস্তবতা হলো, আল্লাহ্ তা'লার দরবারে দোয়া করে এক আত্মাকে ফিরিয়ে আনা যার প্রমাণের ক্ষেত্রে আপত্তিকারীদের অনেক আপত্তিও থেকে থাকে কিন্তু এখানে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ, তাঁর এহসান এবং হযরত খাতামুল আম্বীয়া (সা.)-এর কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লা এই অধমের দোয়া কবুল করতঃ এমন কল্যাণময় আত্মা প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যার পার্থিব ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। যদিও এই নিদর্শন বাহ্যত মৃতকে জীবিত করার তুল্য মনে হয় কিন্তু প্রণিধানে বোঝা যায় যে, সত্যিকার অর্থে এই নিদর্শন মৃতকে জীবিত করার চেয়েও শত গুণ শ্রেয়। মৃতের আত্মাও দোয়ার মাধ্যমেই ফিরে আসে আর এখানেও দোয়ার মাধ্যমে একটি রূহ নিয়ে আসা হয়েছে কিন্তু সেই রূহ বা আত্মা আর এই রূহ বা আত্মার মাঝে লক্ষ ক্রোশের ব্যবধান রয়েছে।" (মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১৪-১১৫)

এরপর আপন পর সবাই দেখেছে যে, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী কত মহিমার সাথে পূর্ণতা লাভ করেছে। আর যুগ প্রমাণ করেছে যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী যার সত্তায় তা পূর্ণ হয়েছে তিনি ছিলেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)। জামাতের আলেম শ্রেণী এবং জামাতের সদস্যরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখতো যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) সংক্রান্তই কিন্তু খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) কখনও এটি বলেননি বা ঘোষণা করেননি যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী আমার সম্পর্কে আর আমিই মুসলেহ্ মওউদ এর সত্যায়নস্থল। এমনকি তাঁর খিলাফতের দীর্ঘ ত্রিশ বছর কেটে যায়, অবশেষে ১৯৪৪ সনে তিনি (রা.) ঘোষণা করেন যে, আমিই মুসলেহ্ মওউদ বা প্রতিশ্রুত পুত্র।

আজ আমি এ সংক্রান্ত হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর দু'টো খুতবা থেকে সংক্ষিপ্তভাবে অনেকটা তাঁর ভাষাতেই কিছুটা বর্ণনা করবো। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) ১৯৪৪ সনের ২৮শে জানুয়ারীর খুতবায় বলেন যে, আমি এমন একটি কথা বলতে চাই যা বর্ণনা করা আমার স্বভাব ও প্রকৃতির দিক থেকে আমার জন্য কঠিন কাজ। কিন্তু কিছু ভবিষ্যদ্বাণী এবং ঐশী তক্বদীর এই কথা বর্ণনার সাথে সম্পর্ক রাখে, তাই আমি আমার স্বভাব এবং প্রকৃতিগত দ্বিধা-দ্বন্দ সত্ত্বেও এটি থেকে বিরত থাকতে পারি না। এরপর তিনি এক দীর্ঘ স্বপ্নের উল্লেখ করেন আর সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, সেই ভবিষ্যদ্বাণী যা মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ছিল খোদা তা'লা তা আমার সত্তার জন্যই নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। ইতোপূর্বে খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এ সম্পর্কে কখনও স্পষ্টভাবে কিছু বলেননি। তিনি বলেন, মানুষ বলে এবং বারংবার বলে যে, এই সব ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে আপনার কি মতামত, কিন্তু আমার অবস্থা এমন ছিল যে, আমি এসব ভবিষ্যদ্বাণী এই আশঙ্কায় কখনও পুরো মনোযোগ সহকারে পড়ারও চেষ্টা করিনি যে, কোথাও আমার নিজের প্রবৃত্তি আমাকে প্রতারিত না করে আর নিজের সম্পর্কে কোথাও আমি এমন কথা যেন ভেবে না বসি যা সত্য পরিপন্থী।

অতএব দেখুন, যিনি সত্যিকার অর্থে মুসলেহ্ মওউদ তিনি কত সতর্ক আর অন্য যাদের মাথা বক্র তারা কোন নিদর্শন ছাড়াই দাবি করে বসে। এদেরকে পাগল বা উন্মাদ ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে? যাহোক এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে তাঁর নিজের প্রকৃতিগত দ্বিধা-দ্বন্দ এবং লজ্জাশীলতার কথা তিনি এভাবে উল্লেখ করেন যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) একবার আমাকে একটি পত্র দেন এবং বলেন যে, এই পত্র তোমার জন্ম সংক্রান্ত, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজে আমাকে এটি লিখেছিলেন। এই পত্র তাশহীযুল আযহান পত্রিকায় ছাপিয়ে দাও। তাশহীযুল আযহান জামাতের একটি মাসিক পত্রিকা, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-ই এটি আরম্ভ করেছিলেন আর তিনিই এটি ছাপাতেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর প্রতি সশ্রদ্ধা বশতঃ আমি সেই পত্র হাতে নিই এবং ছাপিয়েও দিই, কিন্তু তখনও আমি গভীর মনোযোগ সহকারে এটি পড়িনি। তখনও এই পত্র ছাপার পর মানুষ অনেক কথা বলেছে কিন্তু আমি নীরব ছিলাম। আমি এটি বলতাম যে, এই কথাগুলো যার সম্পর্কে তার সামনে এগুলো নিয়ে আসা এবং বলা আবশ্যক নয় বা এটি আবশ্যক নয় যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী যার সম্পর্কে তাকে বলতেই হবে যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নস্থল আমি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি বলেন যে, রেল গাড়ি সম্পর্কে রসূলে করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে, এক যুগে রেল গাড়ি আবিষ্কার হবে আর মান্যকারীরা মানে যে, এই

যুগ ইমামের বাণী

শাহাদতের প্রাথমিক ধাপ হল খোদার পথে অবিচল ও অটল থাকা। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪২৩)

দোয়াপ্রার্থী: Late Younus Gazi From-Raju Gazi
Sb. Ghutiari Shareef, 24 PGS (s)

ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করেছে, কেননা তারা স্বচক্ষে এসব ঘটনাবলী দেখছিল। এখন রেল গাড়ির নিজের এই দাবি করা আবশ্যক নয় যে, আমাতেই রসূলে করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী সত্যায়িত হয়েছে। যাহোক মানুষ আমার সম্পর্কে বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী আমার সামনে রাখে আর জোর দিয়ে বলে, আমি নিজে যেন এই দাবি করি যে, এগুলো আমার সত্তাতেই সত্যায়িত হয়েছে। কিন্তু আমি সবসময় তাদেরএটিই বলেছি যে, ভবিষ্যদ্বাণী কার সত্তায় পূর্ণ হয় তা ভবিষ্যদ্বাণী নিজেই প্রকাশ করে। এসব ভবিষ্যদ্বাণী যদি আমার সম্পর্কেই হয়ে থাকে তাহলে যুগ নিজেই দেখবে যে, আমার সত্তায় তা পূর্ণতা লাভ করেছে আর যদি তা আমার সম্পর্কে না হয় তাহলে যুগের স্বাক্ষ্য আমার বিরুদ্ধে যাবে, আর এই উভয় ক্ষেত্রে আমার কোন কিছু বলার প্রয়োজন নেই। যদি এটি আমার সম্পর্কে না হয় তাহলে আমি দাবি করে কেন গুনাহ্গার হব? আর যদি আমার সম্পর্কেই হয়ে থাকে তাহলে আমার তাড়াহুড়ার কোন প্রয়োজন নেই, আল্লাহ্ তা'লা নিজেই সত্য প্রকাশ করবেন। যেভাবে ইলহামে বলা হয়েছে যে, তারা বলে, আগমনকারী ব্যক্তি কি ইনিই নাকি আমরা অন্য কারো পথপানে চেয়ে থাকবো, এটি ইলহামের বাক্য। পৃথিবীর মানুষ এত বেশি বার এই প্রশ্ন করেছে যে, এক দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। এই দীর্ঘ যুগ সম্পর্কেও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন ইলহামে সংবাদ রয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হযরত ইয়াকুব (আ.) সম্পর্কে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা বলেন, আপনি কি ইউসুফের কথা বলতে বলতে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাবেন বা নিজেকে ধ্বংস করবেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতিও এই ইলহাম হয়। অনুরূপভাবে এই ইলহাম হয় যে, আমি ইউসুফের সৌরভ পাচ্ছি, এক পঙক্তিতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই ইলহামের কথা উল্লেখও করেছেন, এটি থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্র ইচ্ছার অধীনে এ বিষয়টি দীর্ঘকাল পর প্রকাশিত হবে। হযরত ইউসুফও তার পিতার সাথে দীর্ঘকাল পর মিলিত হয়েছেন আর এক দীর্ঘ যুগের অবসানে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করে। তিনি (রা.) বলেন, আমি এই দৃঢ় বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, মৃত্যু পর্যন্তও যদি আমার সামনে এটি প্রকাশ না করা হতো যে, এই সব ভবিষ্যদ্বাণী আমার সম্পর্কে তবুও ঘটনা প্রবাহ নিজেই এটি স্পষ্ট করতো যে, এই সব ভবিষ্যদ্বাণী আমার হাতে এবং আমার যুগেই পূর্ণতা লাভ করেছে। তাই আমাতেই এগুলো সত্য প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় ইচ্ছার অধীনে এই বিষয়টি প্রকাশ করেছেন আর আমাকে এ সংক্রান্ত জ্ঞানও দান করেছেন যে, মুসলেহ্ মওউদ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো আমার সাথে সম্পর্ক রাখে।

তিনি (রা.) কিছু ভবিষ্যদ্বাণীর কথা সংক্ষেপে উল্লেখও করেন, যেমন 'তিনি তিনকে চার করবেন'। তিনি বলেন, এ সম্পর্কে সবসময় প্রশ্ন করা হয় যে, এর অর্থ কি। একইভাবে 'সোমবার বরকতময় বা কল্যাণময় সোমবার' এই সম্পর্কেও প্রশ্নের অবতারণা করা হয়। এই দু'টো বাক্যাংশকে তিনি এইভাবে ব্যাখ্যা করেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তিনকে চার করা সম্পর্কে বা তিনকে চারে রূপ দেয়া সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষাপটে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দৃষ্টি এদিকে নিবদ্ধ হয়েছে যে, তিনি তিন পুত্রকে চারে রূপ দেবেন। এই অর্থ যদি নেওয়া হয় তাহলে চতুর্থ পুত্রের দৃষ্টিকোণ থেকেও এর অর্থ স্পষ্ট। আমার পূর্বে মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব, মির্যা ফযল আহমদ সাহেব এবং মির্যা বশীর আহমদ আউয়ালের জন্ম হয় আর চতুর্থ ছিলাম আমি। আর আমার পরও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তিন পুত্রের জন্ম হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকেও আমি তিনকে চারে পরিণত করেছি এছাড়া আমার খিলাফতকালে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মির্যা সুলতান আহমদ সাহেবকে আহমদীয়াতভুক্ত হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকেও আমি তিনকে চারে পরিণত করেছি। বস্তুত যদি সন্তানের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয় তাহলে আমি তিনভাবে তিনকে চারে রূপ দিয়েছি। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমার মনোযোগ এদিকেও নিবদ্ধ করেন যে, ইলহামে এটি বলা হয়নি যে, তিনি তিন পুত্রকে চারে পরিণত করবেন বরং ইলহামে শুধু এটি বলা হয়েছে যে, তিনি তিনকে চার করবেন। আমার মতে এতে তার জন্মের তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে। এই ভবিষ্যদ্বাণীর সূচনা হয় ১৮৮৬ সনে অর্থাৎ মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর গোড়াপত্তন হয় ১৮৮৬ সনে। তিনি বলেন, আমার জন্ম হয়েছে ১৮৮৯ সনে। সুতরাং তিনকে চারে রূপ দেয়া সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে এই সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, তার জন্ম হবে চতুর্থ বছর, আর এমনই হয়েছে।

আর ভবিষ্যদ্বাণীর এই বাক্য 'সোমবার শুভ সোমবার'এর আরো অর্থ হতে পারে কিন্তু আমার মতে এর একটি স্পষ্ট ব্যাখ্যা হলো সোমবার সপ্তাহের তৃতীয় দিন হয়ে থাকে। অপরদিকে আধ্যাত্মিক জামাতে নবী এবং তাদের খলীফাদের যুগ পৃথক পৃথক হয়ে থাকে। যেভাবে নবীর যুগ নিজ গুণে একটি স্থায়ী স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বা স্বকীয়তা রাখে অনুরূপভাবে খলীফার যুগেরও একটি স্বাতন্ত্র এবং স্থায়ী বৈশিষ্ট রয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করে দেখ যে, প্রথম যুগ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ছিল। দ্বিতীয় যুগ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর ছিল। তিনি বলেন, আর তৃতীয় যুগ হলো আমার। আল্লাহ্ তা'লার আরো একটি ইলহাম এই ব্যাখ্যার সত্যায়ন করছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি এই ইলহাম হয় আর তা হলো ফযলে ওমর। হযরত ওমর (রা.) রসূলে করীম (সা.) থেকে শুরু করে আধ্যাত্মিক ধারার ক্ষেত্রে তিন নম্বর ছিলেন। সুতরাং 'সোমবার শুভ সোমবার' এর অর্থ এই নয় যে, তিনি কোন বিশেষ দিন বা বিশেষ কল্যাণের ধারক বাহক হবে বরং এর অর্থ হলো, এই প্রতিশ্রুত ব্যক্তির দৃষ্টান্ত আহমদীয়াতে এমনই হবে যেভাবে সোমবারের হয়ে থাকে। অর্থাৎ এই জামাতে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে ধর্মসেবার জন্য যাদের দন্ডায়মান করা হবে তাদের মাঝে তিনি তৃতীয় হবেন। ফযলে ওমর-এর যে ইলহামী নাম রয়েছে তাতেও এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। বস্তুত আল্লাহ্র কালাম বা বাণী 'ইউফাস্সেরু বা'যাহু বা'যা' (অর্থাৎ একটি উক্তি অন্য উক্তির ব্যাখ্যা করে থাকে) অনুযায়ী 'ফযলে ওমর' শব্দগুলো 'সোমবার শুভ সোমবার'-এর ব্যাখ্যা করে। তিনি বলেন, কিন্তুএই ইলহামে আরো একটি শুভ সংবাদ রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা এই শুভ সোমবার এমন একভাবেও আনতে যাচ্ছেন যা আমার নিয়ন্ত্রণে নেই। কোন মানুষ বলতে পারে না যে, আমি নিজের ইচ্ছায় বা জেনেশুনে এটির সূচনা করেছি অর্থাৎ তাহরীকে জাদীদের প্রবর্তন, যার সূচনা ১৯৩৪ সনে এমন পরিস্থিতিতে হয়েছে যা কোনভাবেই আমার নিজের নিয়ন্ত্রণে ছিল না। সরকারের একটি কাজ যাতে জামাতের বিরুদ্ধে কিছু কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার ষড়যন্ত্র ছিল এবং আহরারের ফিতনা ওনৈরাজ্যের কারণে আল্লাহ্ তা'লা আমার হৃদয়ে এই তাহরীকের প্রেরণা জোগান । আর এই তাহরীকের প্রথম যুগের জন্য আমি যে সময় নির্ধারণ করেছি তা হলো দশ বছর। প্রত্যেক মানুষ যখন কুরবানী করে বা ত্যাগ স্বীকার করে এরপর তার জন্য একটি ঈদের দিনও আসে। দেখ! রমযান মাসের রোযার পর ঈদ এসে থাকে। অনুরূপভাবে আমাদের তাহরীকে জাদীদের দশ বছর যখন সমাপ্ত হবে, (তিনি যখন এটি বলছিলেন তখনও তা সমাপ্ত হয়নি, তিনি বলেন) এই দশ বছরের পরের বছর হবে আমাদের জন্য ঈদের বছর। আর এই বছরটি অর্থাৎ ১৯৪৪ সনে যা সমাপ্ত হচ্ছে, তিনি বলেন, আশ্চর্যজনক বিষয় হলো ১৯৪৫ সনকে যদি তাহরীকে জাদীদের প্রেক্ষাপটে দেখা হয় যা দশ বছরের তাহরীক ছিল তাহলে এটি হবে একাদশতম বছর যা ঈদের বছর। আর এই বছরটি আরম্ভ হয় সোমবারের মাধ্যমে আর সোমবারকে 'দোশাম্বা' বলা হয়।

(খুতবাতে মাহমুদ, ২৫ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা -৪৯-৬৩)

অতএব আল্লাহ্ তা'লা এই বাক্যে এই সংবাদও দিয়েছেন যে, এক যুগে ইসলামের খুবই দুর্বল অবস্থায় ইসলাম প্রচারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ তবলীগি প্রতিষ্ঠানের ভীত রচিত হবে। আর এর প্রথম যুগ যখন সফলতার সাথে সমাপ্ত হবে তখন তা জামাতের জন্য এক কল্যাণময় যুগ হবে। আর পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ প্রমাণ করেছে যে, আজ তাহরীকে জাদীদের মাধ্যমে পৃথিবীর সকল প্রান্তে ইসলাম ও আহমদীয়াতের তবলীগ পৌঁছে যাচ্ছে। সেই সাথে আজ আমরা দেখছি যে, তাহরীকে জাদীদ তার বেশ কয়েক দশক সমাপ্ত করে পৃথিবীর যে প্রান্তেই আহমদীয়াতের চারা রোপিত হয়েছে সেখানে কাজ করে যাচ্ছে।

আর সেই দীর্ঘ স্বপ্ন যা সম্পর্কে আমি বলেছি যে, যাতে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) মুসলেহ্ মওউদ হওয়ার দাবি করেছেন, সে সম্পর্কে তিনি

যুগ খলীফার বাণী

কঠিন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের একটিই পথ- আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নতজানু হও। (খুতবা, জুমআ, ১০ই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: Late Shohrae Alam & Alia Bibi From-Mahmood Alam Sb. Barisha, 24 PGS (s)

যুগ ইমামের বাণী

জ্ঞান বলতে যুক্তি কিম্বা দর্শনশাস্ত্রকে বোঝানো হয় না, বরং প্রকৃত জ্ঞান সেটাই যা আল্লাহ তা'লা (মানুষকে) কেবল নিজ কৃপাগুণে দান করেন।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৯৫)

দোয়াপ্রার্থী: Late Haji Ansar From-Rezuwan Islam Mandal. Bithari, 24 PGS (N)

বলেন যে, এই স্বপ্নে আমার মুখ থেকে এই বাক্য নিঃসৃত হয় যে, 'আনাল মসীহুল মওউদ, মসীলুহু ওয়া খলীফাতুহু' (অর্থাৎ আমি মসীহ্ মওউদ, তাঁর মসীল এবং খলীফা)। এই শব্দগুলো আমার মুখ থেকে নিঃসৃত হওয়া একটি বিস্ময়কর বিষয় ছিল। জাগ্রত অবস্থায় তো এমনটি হওয়ার ছিলই কিন্তু স্বপ্নেও আমার অন্তরাত্মায় যে অনুভূতি বিরাজমান ছিল তা হলো, এগুলো বড়ই বিস্ময়কর শব্দ যা আমার মুখ থেকে নিঃসৃত হচ্ছে। পরবর্তীতে এই স্বপ্ন শুনার পর মানুষ বলে যে, মসীহি নফস্ (অর্থাৎ নিরাময়ী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী) হওয়ার উল্লেখ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ১৮৮৬ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারীর ভবিষ্যদ্বাণীতে রয়েছে। দ্বিতীয় দিন হযরত মৌলভী সারোয়ার শাহ্ সাহেব বলেন যে, বিজ্ঞাপনের শব্দ হলো, তিনি পৃথিবীতে আসবেন আর তাঁর 'মসীহি নফস্' এবং 'রূহুল হক্ব'-এর কল্যাণে অনেককেই ব্যধিমুক্ত করবেন। তিনি বলেন, আমি নিজেও স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি প্রতিমা বা মূর্তি ভাঙ্গিয়েছি, আর অনেক মূর্তি ছিল যা আমি ভাঙ্গিয়ে দিয়েছি। এতে এই দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তিনি 'রূহুল হক্ব'-এর কল্যাণে অনেককেই ব্যধিমুক্ত করবেন। 'রূহুল হক্ব' তওহীদের বা একত্ববাদের রূহ বা প্রাণকে বলা হয়। আর তিনি সারা পৃথিবীতে ইসলাম প্রচারের ভিত্তি স্থাপন করে পৃথিবীর হৃদয়কে শিরক বা বহুঈশ্বরবাদ থেকে পবিত্র করেছেন। তিনি বলেন, স্বপ্নে আমি আরো দেখি যে, আমি ছুটছি, এটি নয় যে,কেবল দ্রুত পায়ে হাঁটছি বরং দৌড়াচ্ছি আর আমার পদতলের ভূমি ক্রমশঃ সংকুচিত হয়ে আসছে।

প্রতিশ্রুত পুত্র সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে অন্তর্ভুক্ত আরো একটি কথা হলো, সে দ্রুত বড় হবে। অনুরূপভাবে আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি কতিপয় অজানা দেশে গিয়েছি আর সেখানে আমি আমার কাজ সমাপ্ত করিনি বরং আমি আরো এগিয়ে যাওয়ার সংকল্প করি। স্বপ্নে আমি বলি যে, হে আল্লাহ্র কৃতজ্ঞ বান্দা! এখন আমি এগিয়ে যাব, আর সফর থেকে যখন ফিরে আসব তখন দেখবো যে, তুমি তওহীদ বা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছ, শির্ক বা বহুঈশ্বরবাদ নিশ্চিহ করেছ আর ইসলাম এবং মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষাকে হৃদয়ে গ্রথিত এবং প্রথিত করে দিয়েছ। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি যে কালাম বা বাণী অবতীর্ণ করেছেন তাতে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে যে, সে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে খ্যাতি লাভ করবে অর্থাৎ তিনি তবলীগের কাজকে ত্বরান্বিত করবেন। আজ আমরা দেখি যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী নিশ্চয় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর যুগে বড় মহিমার সাথে পূর্ণতা লাভ করেছে। একইভাবে তাঁর এই দীর্ঘ স্বপ্নে মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আরও অনেক কথা আছে যা বিভিন্নভাবে স্বপ্নে তাঁকে দেখানো হয়েছে।

(খুতবাতে মাহমুদ, ২৫তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭১ থেকে সংকলিত)

যাহোক এখন স্বপ্নের প্রেক্ষাপটে বিষয় উপস্থাপনের পরিবর্তে স্বপ্নের পরের বিষয় বর্ণনা করবো। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষাপটে কিছু ঘটনা বা এই ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে সেই ঘটনার যে সামঞ্জস্য যা তাঁর যুগে ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা স্বরূপ সামনে এসেছে তা কিভাবে হয়েছে সেটি বর্ণনা করেন। এখন আমি সংক্ষিপ্তভাবে সেটি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

তিনি বলেন, মানুষ বলতো এ তো নিছক এক বালক। সে যুগে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে খিলাফতের আসনে আসীন করেন। এর প্রতিও ভবিষ্যদ্বাণীতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সে দ্রুত বড় হবে বা বৃদ্ধি পাবে। তিনি (রা.) এ সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার আমি হযরত আম্মাজানের কক্ষে নামাযের অপেক্ষায় পায়চারি করছিলাম, আর সেই কক্ষ ছিল মসজিদ সন্নিবেশিত। তখন মসজিদ থেকে আমার কানে শব্দ আসে যার একটি শেখ রহমতুল্লাহ্ সাহেবের আওয়াজ ছিল যা আমি চিনতে পেরেছি। তিনি বলছিলেন যে, একজন বালককে সামনে এগিয়ে দিয়ে জামাতকে ধ্বংস করা হচ্ছে, এক বালকের খাতিরে এই নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হচ্ছে। তিনি (রা.) বলেন, আমি ভেবে কোন কূল কিনারা পাচ্ছিলাম না যে, সেই বালক কে হতে পারে। অবশেষে মসজিদে গিয়ে আমি একজনকে জিজ্ঞেস করলাম যে, কে সেই বালক? সেই বন্ধু তখন হেসে উঠেন এবং বলেন যে, তুমিই সেই বালক। তিনি (রা.) বলেন, বিরোধীদের এই উক্তি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই কথার সত্যায়ন করছিল যে, সে খুব দ্রুত বড় হবে। তিনি বলেন, আল্লাহ্ আমাকে এত দ্রুত বড় করেন যে, শত্রুরা হতভম্ব হয়ে যায়। কেননা মাত্র কয়েক মাস পূর্বে যারা আমাকে বালক বলতো কয়েক মাস পরই তারা আমাকে এক তঞ্চক, অভিজ্ঞ প্রবঞ্চক বলা শুরু করে এবং আমার দুর্নাম করতে থাকে। এক কথায় শৈশবেই আল্লাহ্ তা'লা আমার হাতে জামাতের অগ্রগতির পথে বিপত্তি সৃষ্টিকারীদের পরাজিত করেন। তিনি বলেন, যদিও মানুষ আমাকে এক বালক মনে করতো আর সত্যিকার অর্থে আমি এক বালকই ছিলাম কিন্তু তা সত্ত্বেও খোদা তা'লা পচিশ বছর বয়সে আমাকে একটি রাজত্ব দান করেন আর সেই রাজত্বও ছিল আধ্যাত্মিক রাজত্ব। পার্থিব রাজত্বে তো বাদশাহ্র কাছে তরবারি থাকে, ক্ষমতা থাকে, জনবল থাকে, সেনাবাহিনী, জেনারেল, কারাগার, ভান্ডার সবই থাকে, তিনি যাকে চান ধরে শাস্তিও দেন কিন্তু আধ্যাত্মিক রাজত্বে যার ইচ্ছা হয় গ্রহণ করে এবং যে গ্রহণ করতে চায় না সে অস্বীকার করে, এখানে ক্ষমতা প্রয়োগের কোন প্রশ্নই নেই। এছাড়া আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এই আধ্যাত্মিক রাজত্বে এমন অবস্থায় দন্ডায়মান করেন যখন ভান্ডারে মাত্র কয়েক আনা বা কয়েক পয়সা অবশিষ্ট ছিল আর সহস্র সহস্র রুপিয়া ঋণ ছিল। এরপর আল্লাহ্ তা'লা এই কাজ আমার ওপর এমন অবস্থায় ন্যাস্ত করেন যখন এই জামাতের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা প্রায় সকলেই বিরোধী ছিল আর এতটা বিরোধী ছিল যে, তাদের একজন হাইস্কুলের দিকে ইঙ্গিত করে বলে যে, আমরা চলে যাচ্ছি, অচিরেই তোমরা এসব ভবনের নিয়ন্ত্রণ ইংরেজদের হাতে চলে যেতে দেখবে। দেখ! এক পঁচিশ বছর বয়স্ক বালক, বাহ্যিক পরিস্থিতিও ছিল যার সম্পূর্ণ প্রতিকূল,অর্থ ভান্ডার ছিল না, অভিজ্ঞ কর্মীও ছিল না, আর ময়দান ছিল শত্রুর নিয়ন্ত্রণে। তারা উল্লসিত ছিল যে, অচিরেই এই জায়গা খ্রিস্টানদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে আর যাকে রাজত্ব দেওয়া হয়েছে তার দিন অধঃপতনে বদলে যাবে আর সে লাঞ্ছনা এবং গঞ্জনাই দেখবে। একজন ব্যক্তি বুঝতে পারে যে,এমন পরিস্থিতিতে জাতির কি অবস্থা হতে পারে। কিন্তু সেই দিন কোথায় আর আজকের দিন কোথায়? মানুষ দেখছে যে, আমার হাতে যখন এই জামাত ন্যাস্ত করা হয় তখন সংখ্যা যা ছিল আজ আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এই সংখ্যা তার চেয়ে শত শত গুণ বেশি। তখন যেসব দেশে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নাম পৌঁছেছিল আজ তার চেয়ে বহুগুণ বেশি দেশে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নাম পৌঁছে গেছে। যে ভান্ডারে শুধু আঠারো আনা ছিল, মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আজ সেই ভান্ডারে লক্ষ লক্ষ রুপিয়া রয়েছে। তিনি বলেন, আজকে যদি আমি মারাও যাই তবুও এই ভান্ডারে আমি লক্ষ লক্ষ রুপিয়া ছেড়ে যাব। এছাড়া এই জামাতের সমর্থনে তার চেয়ে বহুগুণ বেশি লিটারেচার বা বই-পুস্তক রেখে যাব যা আমি পেয়েছিলাম। আর আমি জামাতের সেবার জন্য তার চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞান ভান্ডার রেখে যাব যা আমি তখন লাভ করেছিলাম যখন খোদা তা'লা আমাকে খিলাফতের আসনে আসীন করেছিলেন। সুতরাং সেই খোদা যিনি বলেছিলেন, সে খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাবে আর আল্লাহ্ তা'লার ছায়া তার মাথায় থাকবে, সেই ভবিষ্যদ্বাণী এমন মহিমার সাথে পূর্ণতা লাভ করেছে যে, ঘোর শত্রুও তা অস্বীকার করতে পারবে না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই ভবিষ্যদ্বাণীকে এত গুরুত্বপূর্ণ আখ্যা দিয়েছেন যে, আমি যেভাবে প্রথমেই এ সংক্রান্ত উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেছি যে, এটি কেবল এক ভবিষ্যদ্বাণীই নয় বরং এক মহান নিদর্শন। ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে সেই সন্তানের জন্ম ৯ বছরের ভিতর হওয়া নির্ধারিত ছিল, মূল ভবিষ্যদ্বাণীর শব্দ এটি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, কেউ তো নিজেই জানে না যে, ৯ বছর জীবিত থাকবে কি না আর এটিও জানা থাকে না যে, এই সময়ের ভিতর কোন সন্তান হবে। পুত্র সন্তান হওয়া সংক্রান্ত আনুমানিক কোন ধারণা বা কথা বলার তো প্রশ্নই উঠে না, তাছাড়া এতে শুধু এক পুত্রের জন্মের ভবিষ্যদ্বাণীই করা হয়নি বরং বলা হয়েছে যে, সেই সন্তান ইসলামের সম্মান এবং মহিমার কারণ হবে। সেটি কত ভয়ানক যুগ ছিল যখন শত্রুরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ওপর চতুর্দিক থেকে শুধু এ কারণে হামলা করছিল যে, তিনি ইলহাম লাভের দাবি করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে, আমার প্রতি ইলহাম হয়, মুজাদ্দিদের দাবিও ছিল না, মা'মূর হওয়ার দাবিও ছিল না। আর সেই সময় এক সন্তানের ভবিষ্যদ্বাণী করেন যিনি এমন মহান গুণাবলীর আধার হবেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী

"আল্লাহ্ সকল বিষয়ে হিসাবগ্রহণকারী।"

(সূরা নিসা: ৮৭)

দোয়াপ্রার্থী: Sk Imam Hossain sb, Khundanga, Bankura

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: "সর্বদা সত্য কথা বল, যখন তোমাদের কাছে আমানত রক্ষিত হয়, তখন তা আত্মসাৎ করিও না এবং প্রতিবেশীর সহিত সর্বদা সদয় আচরণ কর।" (বাইহাকি ফি শোবিল ঈমান)

দোয়াপ্রার্থী: Sadique Mahdi Hasan, Bithari, 24 PGS (N)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ(রা.) বলেন যে, কারও নায়েবের খ্যাতির কথা যখন বলা হয় এর অর্থ হলো তার মুনীব এবং অনুসরণীয় নেতার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে। আল্লাহ্ তা'লা ভবিষ্যদ্বাণীতে যে বলেছেন, তিনি পৃথিবীর প্রান্ত প্রান্ত পর্যন্ত খ্যাত হবেন, এর অর্থ হলো তার মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ও পৃথিবীর প্রান্ত প্রান্ত পর্যন্ত খ্যাতি লাভ করবেন। দেখ! ভবিষ্যদ্বাণী কত স্পষ্ট। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে আফগানিস্তান একমাত্র দেশ ছিল যে দেশ সম্পর্কে গুরুত্বের সাথে বলা যায় যে, আহমদীয়াতের বাণী সেখানে বিস্তার লাভ করেছে। অন্যান্য দেশে কেবল উড়ন্ত সংবাদ ছিল যা পৌঁছেছে। সেই সংবাদ হয়তো বিরোধীদের ছড়ানো ছিল বা কারো হাতে কোন বই পৌঁছলে সেই বই হয়ত সেই ব্যক্তি কাউকে দেখিয়ে থাকবেন। রীতিমত জামাত যাকে বলা হয় কোন দেশে তা ছিল না। খাজা কামাল উদ্দিন সাহেব ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন (অর্থাৎ এখানে এসে ছিলেন) কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ও জামাতের নাম উচ্চারণ করা সম্পর্কে বলতেন যে, এটি বিষ সদৃশ হবে, তাই জামাত এবং মসীহ্ মওউদের নাম নিবে না। তাই ইংল্যান্ডে যদি কারো নামের খ্যাতি হয় তাহলে তা ছিল খাজা সাহেবের, জামাতের নয় বা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নয়। আর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা যখন খলীফা নিযুক্ত করেন খোদা তা'লার অপার অনুগ্রহে সুমাত্রা, জাভা, ষ্ট্রেট সেটেলম্যান্ট, চীন ইত্যাদি দেশে আহমদীয়াতের প্রসার ঘটে। একইভাবে মরিশাস এবং আফ্রিকার অন্যান্য দেশেও আহমদীয়াত বিস্তার লাভ করে। সেই সাথে মিশর, ফিলিস্তিন, ইরান এবং অন্যান্য আরব দেশসহ ইউরোপের বেশ কিছু দেশেও আহমদীয়াত ছড়িয়ে পড়ে। আর কোন কোন স্থানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর যুগেও জামাতের সংখ্যা সহস্র সহস্র হয়ে যায়। আফ্রিকায় লক্ষ লক্ষ আহমদী ছিল।

এই ভবিষ্যদ্বাণীতে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আরো একটি সংবাদ এটি দেওয়া হয়েছে যে, তাকে জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হবে। তিনি বলেন, দাবি করা আমার অভ্যাস নই কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সত্য আমি গোপন করতে পারি না যে, ইসলামের সেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদী যার ওপর আলোকপাত করা বর্তমান যুগের নিরীখে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আল্লাহ্ তা'লা তা সম্পর্কে আমার বক্তৃতা এবং আমার রচনায় প্রবন্ধ লিখিয়েছেন আর এমন সব বিষয়াদী লিখিয়েছেন যে, সেসব রচনাবলীকে যদি এক পাশে রেখে দেওয়া হয় তাহলে পৃথিবীতে ইসলামের তবলীগ করা সম্ভব নয়। কুরআনে এমন অনেক বিষয় আছে যা এ যুগের নীরিখে মানুষের জন্য বোঝা সম্ভব ছিল না আর যদি অন্যান্য আয়াতের আলোকে সেগুলোর ব্যাখ্যা না করা হতো, আর এটি খোদার কৃপা যে, তিনি আমার মাধ্যমে সেসব কঠিন বিষয়াদির সমাধান দিয়েছেন। তিনি বলেন, ইসলাম এখন এমন একটি যুগ অতিবাহিত করছে যা দুর্বলতার যুগ এবং শক্তিহীনতার যুগ। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা পুনরায় ইসলামের সুরক্ষার ভীত রচনা করেছেন কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে ইসলামের ওপর সেই সাংস্কৃতিক হামলা হয়নি যা আজ করা হচ্ছে। তাই আল্লাহ্ তা'লা তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এ যুগে এক ব্যক্তিকে তাঁর বাণীর মাধ্যমে সম্মানিত করতে চেয়েছেন, যিনি তৌহীদের কল্যাণরাজিতে কল্যাণ মণ্ডিত হবেন, যিনি জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ হবেন, যিনি শত্রুর এই সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ব্যাখ্যার আলোকে আর কুরআনী ইচ্ছা অনুসারে দূরীভূত করবেন এবং ইসলামের সুরক্ষার দায়িত্ব পালন করবেন। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা নিজের কাজ করেছেন আর আমার রচনাবলীর ওপর তাঁর সত্যায়নের মোহর লাগিয়েছেন। তিনি বলেন, যতদিন আল্লাহ্ তা'লা আমায় আদেশ করেন নি, আমি নীরব ছিলাম। কিন্তু খোদা তা'লা যখন আমাকে অবহিত করলেন আর শুধু অবহিতই করলেন না বরং বললেন যে, আমি যেন মানুষকেও তা জানিয়ে দিই, তখন আমি আপনাদেরকে তা অবহিত করছি যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী সকল দৃষ্টিকোণ থেকে আমার ক্ষেত্রে পূর্ণ হয়। তিনি বলেন, খোদা তা'লা শুধু আমাকেই তা জানানোর নির্দেশ দেন নি বরং নিজ অনুগ্রহে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন যা এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নের জন্য প্রমাণস্বরূপ। যেভাবে আকাশে চন্দ্র উদিত হলে তার চতুর্দিকে নক্ষত্ররাজী নিয়ে আসেন, অনুরূপভাবে এই দিনগুলোতে অনেকেই এমন স্বপ্ন দেখেছে যাতে আমার সেই স্বপ্নের বিষয়ের পুনরাবৃত্তি রয়েছে। আমার এই স্বপ্নের পর এক বন্ধু ডাক্তার মোহাম্মদ লতিফ সাহেব লিখেছেন যে, তিনি স্বপ্নে দেখেছেন, এক ফিরিশতা আমার নাম নিয়ে বলছে যে, নবী এবং রসূলদের সাথে এর নাম নেওয়া হবে। নবী এবং রসূলদের সাথে নাম নেওয়ার অর্থ তাই যার প্রতি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীতেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তিনি মসীলে মসীহ্ হবেনঅর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নবী এবং রসূল আর তাঁর সাথে আমার নামও নেওয়া হবে। একই ভাবে আরেক বন্ধু লিখেছেন যে, আমি স্বপ্নে দেখেছি, মিনারে দাঁড়িয়ে আপনি اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ -র ঘোষণা দিচ্ছেন (অর্থাৎ আল্লাহ্ কী তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? এই কথা ঘোষণা করছিলেন)। اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রারম্ভিক যুগের ইলহামগুলোর একটি। আর মিনারে দাঁড়িয়ে এই ইলহামের ঘোষণার অর্থ হলো, খোদা তা'লা আহমদীয়াতের তবলীগ এবং প্রচাররের কাজকে আমার মাধ্যমে আরো দৃঢ়তর করবেন। যেভাবে পূর্বেও বর্ণনা করা হয়েছে যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর যুগে ইসলাম প্রচারের কাজ ব্যাপক পরিসরে আরম্ভ হয়েছে। আর সেসব ভিত্তির ওপরই এখন নির্মাণের কাজ চলছে।

এরপর তিনি তাঁর কিছু স্বপ্ন এবং ইলহামের কথা নিজ সমর্থনে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে তাঁর ওহীর মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীতে যে কাজের উল্লেখ রয়েছে সেই কাজের জন্য তিনি আমাকে প্রস্তুত করেছেন। তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগ বা খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর খিলাফতের প্রথম যুগে আমি স্বপ্ন দেখেছি, আর আমি তখনই মেজর সৈয়দ হাবীবুল্লাহ্ শাহ্ সাহেবকে এবং অন্যান্য বন্ধুদেরকে তা শুনিয়েছি। ইনি ছিলেন লাহোরের সেন্ট্রাল জেলের হল সুপার । তিনি বলেন, কয়েক দিন পূর্বে তিনি স্বয়ং আমার কাছে সেই স্বপ্নের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আমি দেখেছিলাম যে, আমি আহমদীয়া মাদ্রাসাতে আছি, সেখানে মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেবও দাঁড়িয়ে আছেন। ইত্যবসরে শেখ রহমতুল্লাহ্ সাহেব সেখানে এসে উপস্থিত হন। আমাদের উভয়কে দেখে তিনি বলেন, চলুন দেখি আপনি লম্বা নাকি মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেব, আমার কিছুটা সংকোচ ছিল সেই প্রতিযোগিতায় কিন্তু তিনি আমাকে টেনে সেখানে নিয়ে যান যেখানে মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেব দাঁড়িয়ে ছিলেন। বাস্তবে মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেব উচ্চতায় আমার চেয়ে ছোট হবেন না বরং কিছুটা লম্বাই হবেন, কিন্তু শেখ সাহেব যখন আমাকে এবং তাকে পাশাপাশি দাঁড় করান তখন তিনি অবলিলায় বলে ওঠেন যে, আমার ধারণা ছিল মৌলভী সাহেব লম্বা কিন্তু আপনি লম্বা প্রমাণিত হলেন। স্বপ্নে আমি দেখি যে, কোন রকমে তার মাথা আমার বুক পর্যন্ত পৌঁছে। এরপর শেখ রহমতুল্লাহ্ সাহেব একটি টেবিল নিয়ে আসেন এবং সেই টেবিলের ওপর তাকে দাঁড় করান কিন্তু তবুও তিনি আমার চেয়ে ছোট ছিলেন। এরপর তিনি টেবিলের ওপর একটি টুল রাখেন এবং তাতে মৌলভী সাহেবকে দাঁড় করান কিন্তু তবুও তিনি আমার চেয়ে ছোটই ছিলেন। এরপর তিনি মৌলভী সাহেবকে উঠিয়ে আমার মাথার সমান উচ্চতায় নিয়ে আসেন কিন্তু তবুও তিনি নিচেই ছিলেন উপরন্তু তার পা এমনভাবে বাতাসে ঝুলতে থাকে যেন আমার মোকাবেলায় তিনি এক বাচ্চা বই কিছুই নয়, বড় কষ্টে আমার কনুই পর্যন্ত তার পা নামে। তো দেখ! এই সকল প্রতিযোগিতা এবং এর পরিণামের সংবাদ কত সুন্দরভাবে দেওয়া হয়েছে যা মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেবের সাথে হওয়ার ছিল। অথচ প্রথম খিলাফতের যুগের কথা যদি নেওয়া হয় তাহলে সেই যুগে জামাতে মাথাচাড়া দিচ্ছিল খাজা কামাল উদ্দিন, মৌলভী মোহাম্মদ আলী নয় কিন্তু পরবর্তীতে যে সমস্ত বিতণ্ডা দেখা দেয়ার ছিল আল্লাহ্ তা'লা এতে তার চিত্র পুরোপুরি অঙ্কন করে দেখিয়েছেন। দেখ!মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেব আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এতটাই অধঃপতিত হয়েছেন যে, তার পুরো প্রচেষ্টা এই কথা প্রমাণের জন্য নিবেদিত হয় যে, আল্লাহ্‌র দরবারে তারাই সম্মানিত হয় যারা ছোট। প্রথমে তিনি বলতেন যে, আমরা শতকরা ৯৫ ভাগ আর এরা হলো ৪/৫

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

নিশ্চয়আল্লাহ্ তিনি, যিনি পরম রিয্‌কদাতা, শক্তির অধিকারী, সুদৃঢ়। (আয যারিয়াত: ৫৯)

দোয়াপ্রার্থী: Late Abu Bakar Siddiq & Manjuara Mandal, From Abu Hasan Mondol . Bithari, 24 PGS (N)

যুগ ইমামের বাণী

পরনিন্দা ও পরচর্চা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা উচিত।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড,পৃ: ৪০৭)

দোয়াপ্রার্থী: Mirza Naeema Begum & Family Bithari, 24 PGS (N)

ভাগ, আর জামাতের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী কখনও ভ্রষ্টতায় একমত হতে পারে না কিন্তু এখন বলে কাদিয়ানের জামাতের লোক সংখ্যা বেশি আর আমরা সংখ্যালঘু কিন্তু তাদের সংখ্যা বেশি হওয়াই মিথ্যাবাদী হওয়ার প্রমাণ কেননা আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, আমার সত্যিকার বান্দা তো সংখ্যায় কমই হয়ে থাকে। এটি অবিকল সেই চিত্রই যা এই স্বপ্নে অবহিত করা হয়েছে যে, তিনি এতটাই অধঃপতিত হয়েছেন যে, এই অধঃপতিত হওয়াই বা এত ছোট হওয়াই তার দৃষ্টিতে তার সত্যতার প্রমাণ।

(খুতবাতে মাহমুদ, ২৫তম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৯২-৯৩ থেকে সংকলিত)

এরপর আরো একটি স্বপ্ন বরং একটি ইলহামের উল্লেখ রয়েছে। তিনি বলেন যখন জামাতে মতভেদ দেখা দেয় আল্লাহ্ তা'লা আমাকে ইলহামে অবহিত করেন যে, 'লানুমায্যেকান্নাহুম' আমরা তাদেরকে টুকরো টুকরো করে দিব। তখন এরা দাবি করতো যে, আমরা শতকরা ৯৫ জন, কিন্তু এখন দেখ তাদের কি অবস্থা হয়েছে। এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আল্লাহ্ তা'লা সত্যিকার অর্থেই তাদেরকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছেন। খাজা কামাল উদ্দিন সাহেব তার মৃত্যুর পূর্বে লিখেছেন যে, মির্যা মাহমুদ আমাদের সম্পর্কে যে ইলহাম ছাপিয়েছে তা একশতভাগ পূর্ণতা লাভ করেছে, আমরা সত্যিই টুকরো টুকরো হয়ে গেছি। তো যেভাবে ইলহামে সংবাদ দেওয়া হয়েছে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'লা নিজ অনুগ্রহে আমার প্রতি যে সমস্ত ইলহাম করেছেন এখন কেবল এতটাই বর্ণনা করছি, তিনি আরো কিছু বর্ণনা করেন, আমি শুধু দু'টো আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। তিনি বলেন, আমার ইচ্ছা হলো খোদার নিয়ামতের স্বীকারোক্তি হিসেবে একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকায় আমার কিছু ইলহাম এবং কাশফের কিছুটা বিস্তারিত বিরণ উল্লেখ করব। (খুতবাতে মাহমুদ, ২৫তম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৯২-৯৩ থেকে সংকলিত) এটি পুস্তক আকারে ছাপা রয়েছে অনেক বড় একটি গ্রন্থ এটি।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, আল্লাহ্ তা'লা বারংবার আমার সামনে অদৃশ্যের সংবাদ প্রকাশ করে এইভবিষ্যদ্বাণীকে সত্য প্রমাণ করেছেন যে, মুসলেহ্ মওউদ খোদার তৌহীদের জ্ঞানে সম্মানিত হবেন, এগুলো খোদার নিদর্শন যা তিনি আমার সামনে প্রকাশ করেছেন। মানুষ বলে যে, বন্ধুরা তো বা আহমদীরা তো পূর্বেই বলে আসছে যে, এই সব ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নস্থল আমি অথচ আমি এখন মাত্র দাবি করলাম যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী আমার ক্ষেত্রেই পূর্ণতা লাভ করেছে। তো এর পিছনে হিকমত কি বা যুক্তি কি। তিনি বলেন, এর পিছনে হিকমত বা যুক্তি সেটিই যা কুরআন বলে যে, مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ' (সূরা বাকারা: ১৪৪) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা যখন নবীর আবির্ভাবের পর প্রতিশ্রুত কাউকে দাঁড় করান তখন তিনি এটি পছন্দ করেন না যে, তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামাত অবিশ্বাসের শিকার হবে বা তাদের ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। তাই তিনি এমন পরিস্থিতির অবতারণা করেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী তাকে প্রতিশ্রুত বা মওউদ মানতে বাধ্য হয়। মানুষ যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীগুলো আমার সত্তায় পূর্ণ হতে দেখে তখন তারা ঈমান এবং বিশ্বাসে আরো দৃঢ় হয়, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্তায় তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। তিনি বলেন, আমার পক্ষ থেকে পরে ঘোষণা করা আর জামাতের পক্ষ থেকে পূর্বেই আমাকে এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নস্থল আখ্যা দেওয়ার ক্ষেত্রে হিকমত হলো, আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদেরকে দ্বিতীয়বার কুফর এবং ইসলামের পরীক্ষায় নিপতিত করে তাদের ঈমান নষ্ট করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না আর তিনি এটি চাইতেন না যে, জামাতের ওপর দু'টো মৃত্যু আসুক, প্রথম মৃত্যু সেটি যখন এরা অর্থাৎ যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনেছে, কিন্তু তারা মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মিথ্যা আখ্যায়িত করেছিল কিন্তু পরবর্তীতে তাদের কোন পুণ্যের কারণে আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করেছেন, তাদেরকে জীবিত করেছেন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতভুক্ত করেছেন। তারা আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ করেছেন, কষ্ট সহ্য করেছেন

এরপর ১৮এর পাতায়....

দিল্লীতে সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.)-এর মজলিসে ইরফান (প্রশ্নোত্তর সভা)

২রা অক্টোবর, দিল্লী (সেপ্টেম্বর): আজ সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন আল মুসলেহ মওউদ খলীফাতুল মসীহ আস সানী (আই.) মগরিবের নামযের পর মজলিসে উপস্থিত থাকেন। সদস্যদের মধ্য থেকে অনেকে হুযুরকে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন আর হুযুর সেগুলির উত্তরে তত্ত্বজ্ঞান সমৃদ্ধ উত্তর প্রদান করেন। যে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন তা তার সারাংশ নিজের ভাষায় বর্ণনা করা হচ্ছে।

হাত তুলে দোয়া করার মধ্যে কোন্ প্রজ্ঞা নিহিত আছে?

জানতে চাওয়া হল যে, হাত তুলে দোয়া করার মধ্যে কি প্রজ্ঞা নিহিত আছে?

হুযুর বলেন: দোয়া করার সময় অন্তরে বিগলন সৃষ্টি হওয়া জরুরী, যেটা মানুষের জন্য একটা আবেগপূর্ণ অবস্থা। নিজের আবেগ ও উচ্ছ্বাসের অনুভূতিপূর্ণ অবস্থাকে গোপন করার মানুষের প্রকৃতি। মানুষ যদি এই অবস্থাকে গোপন না করে, তবে তার সেই আবেগে ভাটা পড়ে। তাই চিত্তের বিগলন ও আবেগকে গোপন করার জন্য ইসলাম দোয়া করার সময় হাত তোলার আদেশ দিয়েছে, যাতে মানুষ ও দোয়া প্রার্থনাকারীদের মাঝে একটা অন্তরায় থাকে।

নামাযের পর দোয়া

জানতে চাওয়া হয় যে, নামাযের পর দোয়া কেন করা হয় না?

হুযুর বলেন: এজন্য যে, রসুল করীম (সা.) কখনও এই রীতি অবলম্বন করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমরা সর্বাবস্থায় রসুল করীম (সা.)কে অনুসরণ করার চেষ্টা করব। যদিও বিশেষ পরিস্থিতিতে নামাযের পর দোয়া করেও নেওয়া হয়, তবে তাতে বাধা নেই। কিন্তু এটিকে আবশ্যিক ক্রিয়া হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা বিদাতের পর্যায়ে পড়ে। এভাবে দিন দিন নিত্যনতুন প্রথার আবির্ভাব হতে থাকবে। আর মানুষ প্রথার দাস হয়ে উঠবে। অতএব, ইসলাম নীতিগতভাবে কেবল সেই সমস্ত কাজকে আবশ্যিক হিসেবে আখ্যায়িত করেছে, যেগুলি রসুল করীম (সা.)-এর কর্মধারা থেকে প্রমাণিত।

মহিলাদের জন্য জুমআর নামায

নিবেদন করা হয় যে, মহিলারা কি পুরুষদের থেকে পৃথক হয়ে অন্যত্র একত্রিত হয়ে জুমআর নামায পড়তে পারে?

হুযুর বলেন: যদি কোনও বিশেষ বাধ্যবাধকতা না থাকে, তবে তার ভিত্তিতে মহিলাদেরকে পৃথকভাবে একত্রিত হয়ে জুমআর নামায পড়ার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে, যাতে তাদের ধর্মীয় চেতনা বজায় থ াকে। কিন্তু যদি সাধারণ অবস্থাতেও এমনটি করার অনুমতি দেওয়া হয়, তবে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা তৈরী হয়। পুরুষদের চিন্তাধারা এবং মহিলাদের চিন্তাধারা পৃথক খাতে চালিত হয়। এই জন্য সাধারণ অবস্থায় এটাই নির্দেশ রয়েছে যে, পুরুষ ও মহিলা একই স্থানে একত্রিত হয়ে জুমআর নামায পড়বে।

দিল্লীর আহমদী কিশোর দল

মগরিব ও এশার নামাযের পর দিল্লীর আহমদী কিশোরা হুযুরের সমীপে উপস্থিত হয়। হুযুর তাদেরকে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। যেমন-আল্লাহ্ কাকে বলে? রসুল কাকে বলে? নবী কাকে বলে? মসীহ মওউদ বলতে কি বোঝায়? আহমদীয়াতের অর্থ কি? নামায কেন পড়া হয়? কতবার নামায পড়তে হয় এবং কত রাকাত করে পড়তে হয়? ফরজ নামায কত রাকাত করে এবং সুন্নত কত রাকাত করে পড়তে হয়? ইত্যাদি বিভিন্ন প্রশ্ন তিনি করেন। শিশুদের প্রশ্নগুলি করার পর তিনি উত্তরগুলি অত্যন্ত সহজবোধ্য ভাষায় সঠিক করে দেন।যেমন -হুযুর বলেন, পৃথিবীতে আমরা যা কিছু দেখতে পাই, সমস্ত কিছু যিনি সৃষ্টি করেছেন,তাঁকে আমরা আল্লাহ্ বলি। নবীর অর্থ হল সংবাদদাতা। আর রসুলের অর্থ প্রেরিত।আল্লাহ্ তা'লা যখন তাঁর কোনও বান্দাকে মানুষের সংশোধনের জন্য প্রেরণ করেন তখন সেই বান্দাকে নবী ও রসুল বলা হয়। নবী ও রসুল আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত এবং জীবনযাপনের জন্য যে পদ্ধতি তা আল্লাহ্ তা'লার আদেশে মানুষকে শিক্ষা দেন। সেই আদেশনামাকে বলা হয় শরিয়ত। হযরত মসীহ বা ঈসা (আ.)-এর পুনরাগমণের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। যেহেতু এই ভবিষ্যদ্বাণী হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আগমণে পূর্ণ হয়েছে, তাই আমরা তাঁকে মসীহ মওউদ বলে থাকি। অর্থাৎ সেই মসীহ যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ইসলামের যে প্রকৃক রূপ পৃথিবীর সামনে তুলে ধরেছেন, সেটাকে আমরা আহমদীয়াত বলে থাকি। নামায এজন্য পড়া হয় যে, আমাদের ধর্মে নামায পড়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। যোহরের সুন্নত প্রসঙ্গে হুযুর বলেন- এর তিনটি বিকল্প বৈধ। প্রথমত, ফরজ নামাযের পূর্বে চার রাকাত সুন্নত এবং চার রাকাত সুন্নত ফরজের পর। দ্বিতীয় বিকল্প হল, ফরজের পূর্বে দুই রাকাত সুন্নত এবং ফরজের পর দুই রাকাত সুন্নত। তৃতীয় বিকল্প হল, ফরজের পূর্বে চার রাকাত সুন্নত এবং ফরজের পর দুই রাকাত সুন্নত।

(রোজনামা আল ফজল, কাদিয়ান দারুল আমান, ১১ অক্টোবর, ১৯৪৬)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-10 Thursday, 13-20 Feb, 2025 Issue No. 7-8

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs.12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

"তোমার আশিসসমূহের জ্যোতি পুনরায় প্রকাশ করার জন্য তোমার মাঝে থেকে এবং তোমারই বংশধরদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে দাঁড় করানো হবে"

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর মাধ্যমে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আশিসসমূহের প্রকাশ

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র বাণী

'খোদা আমাকে প্রতিশ্রুতি দান করে বলেছেন, 'তোমার আশিসসমূহের জ্যোতি পুনরায় প্রকাশ করার জন্য তোমার মাঝে থেকে এবং তোমারই বংশধরদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে দাঁড় করানো হবে, যার মধ্যে আমি রুহুল কুদুস (পবিত্রাত্মা)-এর বরকত ফুৎকার করব। সে পবিত্রাত্মার অধিকারী হবে এবং খোদার সঙ্গে এক অতীব পবিত্র সম্পর্ক স্থাপনকারী হবে। সে مَظْهَرُ الْحَقِّ وَالْعَلَاءِ- হবে, যেন আল্লাহ্ আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। "

(তোহফায়ে গোল্ডবিয়া, রূহানী খাযায়েন, ১৭তম খণ্ড, পৃ: ১৮১)

"খোদা তা'লা আমাকে এক প্রত্যয়পূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণীর সংবাদ দান করে জানিয়েছেন যে, আমার বংশধরদের মধ্য থেকেই এক ব্যক্তির জন্ম হবে যে কি না একাধিক বিষয়ে মসীহ্র সঙ্গে সাদৃশ্য রাখবে। সে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হবে আর জগতবাসীর জন্য পথ সরল করবে আর সে বন্দীদের মুক্তি দিবে এবং যারা সংশয়ের শেকলে আবদ্ধ তাদের মুক্তি দিবে। সম্মানিত মহৎ, প্রিয়-পুত্র مَظْهَرُ الْحَقِّ وَالْعَلَاءِ- كَأَنَّ اللهَ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ

(ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৮০)

"আমি তোমার জামা'তের জন্য তোমারই বংশধর থেকে এক ব্যক্তিকে দন্ডায়মান করব এবং তাঁকে আমার নৈকট্য ও ঐশী বাণীর মাধ্যমে বৈশিষ্ট্য মন্ডিত করবো। তাঁর দ্বারা সত্যের উন্নতি হবে এবং বহু লোক সত্যকে গ্রহণ করবে।

অতএব, সেই সময়ের জন্য প্রতীক্ষা কর। তোমরা স্মরণ রাখবে যে প্রত্যেকের পরিচয় তার জন্য নির্ধারিত সময়ে পাওয়া যায় এবং তৎপূর্বে তাকে একজন সাধারণ ব্যক্তি বলে মনে হতে পারে অথবা কোন ভ্রান্ত ধারণাবশতঃ তাকে সমালোচনার যোগ্য বলে প্রতিপন্ন করা সম্ভবপর। যেমন এক সময়ে যিনি একজন কামেল পুরুষ হবেন, নির্দিষ্ট কাল পূর্বে তিনিও মাতৃগর্ভে 'নুৎফা' (বীর্য) অথবা ঘনীভূত রক্তস্বরূপই অবস্থান করেন।"

(আলওসিয়ত পুস্তিকা, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ৩০৬, টীকা)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir